ব্লক :
স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোং

প্রচ্ছদপটশিল্পী :
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

প্রথম মুদ্রণ :
৫,৫০০ কপি

প্রথম প্রকাশ :
সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

বিগত দিনের সমাজজীবন ও সভ্যতার মূল্যায়নে অতীতের কীর্তি-চিহ্নসমূহের গুরুত্ব অবশ্যই অপরিমেয়। প্রাচীন দেবায়তনগুলি ও তাৎপর্যময় পরিকল্পনায় সৃষ্ট বিভিন্ন স্থাপত্যকর্ম যেন যুগ-পরম্পরায় অনুসৃত আদর্শ ও প্রেরণার সাক্ষ্যস্বরূপ। বাংলার ইতিহাসে বারংবার শিল্পের এই উত্তরণ অনুভূত। ধর্মীয় চেতনা, সমৃদ্ধির তারতম্য ও সমন্বয়ের প্রেক্ষাপটে শিল্পীর এক বিশিষ্ট অন্তরঙ্গতা ও শাস্ত্রীয় রূপ-ভাবনার অবিনশ্বরতা বিঘোষিত। অজয়, বক্রেশ্বর, চন্দ্রভাগা, ময়ূরাক্ষী ইত্যাদি নদীর স্রোতধারাবিধৌত বীরভূম জেলার প্রাচীন প্রান্তর ও উপত্যকায় আজ যে পুরাকীর্তিগুলি দৃষ্টিগোচর হয় তাদের মূল্যায়ন পশ্চিমবঙ্গের ইতিবৃত্তকে সমৃদ্ধ করবে সুনিশ্চিত। এই জেলায় আবিষ্কৃত ইতিহাস-পূর্বকালীন অধিবসতি-স্তর, সমাধি ও মৃৎপাত্রগুলির গুরুত্ব যেমন অনুধাবনযোগ্য, তেমন উল্লেখ্য এখানে অবস্থিত পোড়া-মাটির অলঙ্করণ ও আলেখ্যরাজিসমন্বিত মন্দিরগুলির অসামান্য সৌন্দর্য ও সুসমঞ্জস অবয়ব। রাজ্যের অপরাপর দৃষ্টান্তের ন্যায় মৃন্ময় মণ্ডন-শিল্পের সুচারুতা ক্ষেত্রবিশেষে বৈশিষ্ট্য দান ক'রেছে এই জেলার মসজিদ-স্থাপত্যকেও।

বিভিন্ন শাক্তপীঠস্থানধন্য বীরভূম জেলার পুরাকীর্তিসমূহ সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের যে প্রয়োজন এতদিন অনুভূত হ'য়েছিল আজ তা' পূর্ণ হ'য়েছে বর্তমান রচনায়। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার পুরাকীর্তি সম্বন্ধে এক একটি গ্রন্থ প্রকাশনের যে পরিকল্পনা ইতিপূর্বে রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত হ'য়েছে শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী রচিত 'বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি' তার দ্বিতীয় গ্রন্থ। এই পুস্তকটির রচনায় যে গবেষণা, অভিজ্ঞতা ও পরিশীলিত নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় তার দ্বারা অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ আকৃষ্ট হবেন আশাকরি।

গ্রন্থকারের নিবেদন

'বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি' পূর্ত বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক পরিকল্পিত এবং অনুমোদিত পুরাকীর্তি বিষয়ক গ্রন্থরাজির দ্বিতীয় প্রকাশন। এই পুস্তকের বিলম্বিত আত্ম-প্রকাশকালে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। বিগত ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের মধ্য হইতে ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে এই জেলার প্রায় অধিকাংশ পুরাকীর্তি সমূহ সরেজমিনে নিরীক্ষণ এবং সেইগুলি সম্বন্ধে তথ্য সঙ্কলন করিয়া পাণ্ডুলিপি বিশেষজ্ঞ কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। তৎকালীন কমিটির সভাপতি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং অপরাপর সদস্য ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ সুধীররঞ্জন দাস এবং পরিশেষে প্রত্নতত্ত্ব উপদেষ্টা পর্ষদের অন্যতম সদস্য অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু কর্তৃক পাণ্ডুলিপিটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচিত হইয়া প্রকাশনার জন্য অনুমোদিত হয়। এই সমস্ত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের বক্তব্য ও অভিমত যথাসম্ভব গৃহীত হইয়া গ্রন্থ মধ্যে আলোচিত হইয়াছে—এই সমস্ত সুধীজনের প্রত্যেককে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

কর্মব্যস্ততার মধ্যে এই গ্রন্থের মুখবন্ধের অংশটি লিখে পূর্ত ও গৃহ বিভাগের বর্তমান মন্ত্রী শ্রীভোলানাথ সেন মহাশয় আমার প্রতি তাঁর সহৃদয়তা প্রকাশ করে আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন, তাঁকে আমার শ্রদ্ধা জানাই।

পূর্ত বিভাগের প্রাক্তন যুগ্ম সচিব শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই. এ. এস. মহাশয় গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপির অনুমোদন এবং তারপর মুদ্রণ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে সচেষ্ট হন। এছাড়া শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক গৃহীত এবং পরিস্ফুট প্রায় সমস্ত আলোকচিত্রগুলি এই গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। এই সমস্ত সহযোগিতার জন্য আমি তাঁর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। পূর্তবিভাগের সংশ্লিষ্ট সহসচিব শ্রীদুর্গাদাস ঘোষাল মহাশয় এবং অন্যান্য সহায়কবৃন্দের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে যথেষ্ট বিলম্ব হইলেও গ্রন্থখানি আত্মপ্রকাশ করিতে পারিল—এজন্য তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে গমনাগমনের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য পূর্তবিভাগের বীরভূম বিভাগের তৎকালীন নির্বাহী বাস্তুকার শ্রীদেবব্রত মজুমদার মহাশয়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতা স্মরণীয় এজন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁর বিভাগীয় জীপচালক শ্রীচন্দ্রমোহন সিংহ অনেক পরিশ্রম সহকারে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের লইয়া উপস্থিত হইয়া তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করিবার জন্য ধন্যবাদার্হ।

প্রত্নতত্ত্ব অধিকর্তা শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহোদয়ের সদা-প্রসারিত বিবিধ সাহায্য প্রদানের জন্য আমি তাঁর নিকট বিশেষভাবে ঋণী। তথ্য সঙ্কলনকালে বিভিন্ন পর্যায়ে অধিকারের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান সহায়ক শ্রীসুধীন কুমার দে এবং প্রধান করণিক শ্রীকনকরঞ্জন মজুমদার তাঁদের সক্রিয় সহায়তা দানের দ্বারা যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করেন, সহকর্মীদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। বীরভূম জেলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ কালে সময় সময় ক্লেশকর পরিস্থিতির মধ্যে এই অধিকারের অন্যতম কর্মী শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আন্তরিক সহায়তা প্রশংসনীয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহাকরণ গ্রন্থাগার, ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার (পূর্বচক্র) গ্রন্থাগার এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিকগণের অকুণ্ঠ সাহায্যের ফলে গ্রন্থটি তথ্য-সমৃদ্ধ করিতে সক্রিয় হইয়াছি; তাঁদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রকাশনা এবং মুদ্রণ ব্যাপারে যথা সম্ভব ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করিয়া শোভনভাবে পুস্তকটি প্রকাশের কৃতিত্ব শ্রীসরস্বতী প্রেসের অন্যতম পরিচালক শ্রীদীপক ঘোষের প্রাপ্য। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মুদ্রণকার্যে এই সংস্থার অন্যতম কর্মী শ্রীকালীপদ দাসের অবদানও প্রশংসনীয়। আলোকচিত্র ইত্যাদির 'ব্লক' প্রস্তুত কার্যে ভারপ্রাপ্ত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানীর পক্ষে শ্রীহীরালাল সেনগুপ্ত সুষ্ঠুভাবে এই দায়িত্ব প্রতিপালন করিয়া আমাদের ধন্যবাদার্হ। মানচিত্র অঙ্কনে প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের প্রত্নকীর্তি সংরক্ষণ সহায়ক শ্রীনেপাল চন্দ্র ভট্টাচার্যের অবদান অভিনন্দনযোগ্য।

সূচীপত্র

ভূমিকা

ভূপ্রকৃতিঃ পশ্চিমবাঙ্গালার পশ্চিম সীমান্তবর্তী এই জেলা বীরভূম, উত্তরে রাজমহলের পর্বতশ্রেণীর তরঙ্গায়িত ধারা এই জেলার উত্তরে কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত; পশ্চিমের ছোটনাগপুরের মালভূমির অন্তর্ভুক্ত বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগণার অনুর্বর ভূভাগের ব্যাপ্তি এই জেলার শাসনকেন্দ্র সিউড়ী সহর পর্যন্ত প্রায় বিস্তৃত। পূর্বের সীমানায় পশ্চিম বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমানায় বর্ধমান জেলা অবস্থিত, গঙ্গানদীর অববাহিকায় অবস্থিত এই অঞ্চল শস্য-শ্যামলা এবং বীরভূমের পশ্চিমদিকের ভূভাগ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। দক্ষিণে অজয় নদ পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বাহিত হইয়া জেলার সীমা নির্ধারণ করিতেছে। অজয় নদের দক্ষিণ তীরে বর্ধমান জেলা অবস্থিত।

'সম্বন্ধ নির্ণয়' গ্রন্থের ক্রোড়পত্রের মধ্যে উদ্ধৃত মহেশ্বরের 'কুলপঞ্জিকায়' এড়ুমিশ্রের উক্তিরূপে বর্ণিত 'বীর ভূমির' বর্ণনা অনেকাংশে বর্তমান সীমারেখাকেই সূচিত করে। 'কুলপঞ্জিকায়' উক্ত আছে:—

"বীরভূঃ কামকোটী স্যাৎ প্রাচ্যা গঙ্গাজলান্বিতা।
আরণ্যকং প্রতীচ্যাঞ্চ দেশোদার্ষদ উত্তরে।
বিন্ধ্যপাদোদ্ভবা নদ্যাঃ দক্ষিণে বহবঃ স্থিতাঃ।"

অর্থাৎ উত্তরে দার্ষদ (প্রস্তরময় ভূভাগ), সম্ভবতঃ রাজমহল পর্বতশ্রেণী, পশ্চিমে অরণ্যভূমি সাঁওতাল পরগণার গহন অরণ্যানী, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত হইতে উদ্ভূত অনেক নদী—ছোটনাগপুরের পার্বত্য ভূমি হইতে নির্গত অজয় নদ এবং তাহার শাখা-প্রশাখাসমূহ আর পূর্বে গঙ্গার স্রোতধারা ইহাই 'কামকোটি বীরভূমে'র প্রাকৃতিক সংস্থান। মহেশ্বরের 'কুলপঞ্জিকায়' 'কামকোটি বীরভূম জানিবে নির্য্যাস' এই উক্তি থাকিলেও এই 'কামকোটি' নামের তাৎপর্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য কান্যকুব্জাগত ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ বাসের নিমিত্ত যথাক্রমে পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম এই পাঁচটি স্থান নির্দেশিত হয়।

"পঞ্চকোটিঃ কামকোটি হরিকোটি স্তথৈবচ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম স্তেষাং স্থানানি পঞ্চচ॥"

'দিগ্বিজয় প্রকাশ' নামক সংস্কৃত ভূগোল গ্রন্থে 'বীর দেশের' উল্লেখ আছে ঃ—

"গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পূর্বতঃ।
দামোদরোত্তরে ভাগে সুহ্ম দেশ প্রকীর্তিতঃ॥"

গৌড়ের পশ্চিমে, বীরদেশের (বীরভূমির?) পূর্বে ও দামোদর নদের উত্তরে অবস্থিত ভূভাগ 'সুহ্ম'নামে কীর্তিত।

এই জেলার নামকরণ 'বীরভূম' সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ-কাহিনী ও লোককথা প্রচলিত। এইগুলির মধ্যে কতকগুলি 'নির্জলা উপকথা' ব্যতীত আর কিছু নহে, অবশ্য কতকগুলি কাহিনীর মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে। (সিউড়ী হইতে প্রকাশিত 'ভাবমুখে' পত্রিকার কার্তিক ১৩৭৭ সংখ্যায় প্রকাশিত লেখক রচিত 'বীরভূম নামকরণ প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।)

কোন অঞ্চলের প্রাকৃতিক গঠন সেই স্থানের ইতিহাস, সংস্কৃতি, শিল্পকলা, অর্থনৈতিক কাঠামো তথা জনজীবনের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে এ কথা সর্বজনবিদিত। বীরভূম জেলার প্রাকৃতিক গঠনও ইহার ব্যতিক্রম নয়। ভূতাত্বিক সময় নিরূপণের মাপকাঠিতে সর্বপ্রাচীন *Archaean Gneiss* স্তরের এই জেলার পশ্চিমাঞ্চলে আবির্ভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গ্রানাইট প্রস্তরের বিরাট বিরাট প্রস্তর-খণ্ড দুবরাজপুরের নিকট 'মামা-ভাগিনা পাহাড়' নামে অভিহিত হইয়া স্থানটিকে সুষমামণ্ডিত করিয়া নানা কিংবদন্তী ও উপকথার সৃষ্টি করিয়াছে। এই জেলায় প্রস্তরনির্মিত পুরাকীর্তির সংখ্যা খুব বেশী নয়। সম্ভবতঃ এই স্থান হইতে আহৃত প্রস্তরখণ্ড হইতে সিউড়ী থানার কবিলাসপুরের মন্দির, খয়রাশোল থানার পাঁচড়ার একবাংলা মণ্ডপ সহ রেখদেউল ও তথাকথিত ভগ্ন বিষ্ণু মন্দির, পাইগোড়া-পুরগুণ্ডীর ভগ্ন মসজিদের স্তম্ভ সমূহ, বক্রেশ্বর মন্দির সংস্থানের মূল বক্রনাথ শিব-মন্দিরের কিয়দংশ নির্মিত হয়। জেলার বহুস্থানের অনাদিলিঙ্গ শিবমূর্তি-গুলির উদ্ভবও সম্ভবতঃ এই ধরনের প্রস্তরস্তরের উপস্থিতির মাধ্যমে ব্যক্ত হইয়া কালক্রমে এইগুলির আবির্ভাবের পিছনে নানা জনশ্রুতি ও প্রবাদের সৃষ্টি করিয়া জনজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তথাকথিত রাজমহলের আগ্নেয় শিলাস্তরের (*Rajmahal Trap*) আবির্ভাবও কয়েকটি কারণে উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী-দের দ্বারা পূজিত বিভিন্ন শিল্প-শৈলী ও ধ্যানানুসারে নির্মিত দেব-প্রতিমা সমূহ এই রাজমহলের আগ্নেয় শিলার মাধ্যমে রূপায়িত হইয়া

তৎকালীন শিল্পীমনের উৎকর্ষ ও শিল্পচাতুর্যের সন্ধান দেয়। নলহাটী থানার বারাগ্রামের ও মুরারই থানার পাইকোড়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন দেব-প্রতিমাসমূহ মধ্যযুগীয় শিল্পশৈলীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বারাগ্রামের মসজিদের প্রস্তরের অংশবিশেষও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'প্লাই-ষ্টোসীন পর্বে'র মধ্যে নিহিত পুরা পলিভূমি (*Older Alluvium*) এই জেলার উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে দেখা যায়। প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তরযুগের মনুষ্য ব্যবহৃত আয়ুধের নিদর্শন সাম্প্রতিককালে এই সমস্ত অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়া আদিমকাল হইতে এই অঞ্চলে জন-জীবনের অস্তিত্ব ও প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতিধারার আদিপর্বের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করিয়া দেয়। নব্য প্রস্তরযুগে ব্যবহৃত নিদর্শনসমূহ যথা প্রস্তর কুঠার ফলক ইত্যাদিও এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়া প্রাচীনকালের কৃষিকর্ম সম্বন্ধে আমাদের আভাস দেয়। পশ্চিম-বাঙ্গালার তাম্র-প্রস্তর যুগের সাংস্কৃতিক বিকাশও এই মৃত্তিকায়। শান্তি-নিকেতনের অদূরে অবস্থিত কোপাই তীরবর্তী মহিষদল গ্রামে পশ্চিম-বাঙ্গালার তাম্র-প্রস্তর যুগের আপাত প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্র প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের মাধ্যমে উদঘাটিত হইয়াছে। রেডিওকার্বন পদ্ধতির সময় নিরূপণের মাপকাঠিতে এই স্থানের স্তর বিন্যাসের প্রথম পর্বের বিকাশ খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮০ অব্দে সাধিত হয় বৈজ্ঞানিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

জেলার মধ্যে অবস্থিত কয়েকটি উষ্ণ ও শীতল জলের প্রস্রবণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া সৃষ্টিকর্তার মহিমার সঙ্গে কিংবদন্তী যুক্ত হইয়া স্থানগুলি তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। সিউড়ীর পশ্চিমে বক্রেশ্বর পীঠস্থানের খ্যাতি এখন সুদূর প্রসারিত ; এখানে কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বর্তমানে রাজ্য সরকারের উন্নয়ন ও পর্যটন বিভাগের সহায়তায় স্থানটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পর্যটকগণের পক্ষে মনোরম স্থানরূপে বিবেচিত।

ঐতিহাসিক রূপরেখা : ছোটনাগপুরের মালভূমির তরঙ্গায়িত রেখা বীরভূমের পশ্চিমপ্রান্তে আসিয়া মিশিয়াছে। এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত নদ-নদী সমূহের গতিপথও অনেকাংশে এই ধারা অনুসরণ পূর্বক পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিকে প্রবাহিত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতেই আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ধারা এই নদীপথকে অনু-সরণ করিয়া বিকশিত হইয়াছে তাহার অসংখ্য নিদর্শন সাম্প্রতিককালের প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও অন্বেষণের মাধ্যমে উদঘাটিত হইয়াছে। বীরভূম

জেলার নদী উপত্যকাগুলিও প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের বসবাসের পক্ষে উপযুক্ত বিবেচিত হয়। আদি প্রস্তরযুগ হইতে শেষ প্রস্তরযুগের অবসান পর্যন্ত তৎকালীন মনুষ্য ব্যবহৃত প্রস্তরায়ুধসমূহ এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত অজয়, বক্রেশ্বর, কোপাই, ময়ূরাক্ষী, দ্বারকা, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি নদী-তীরবর্তী প্রত্নস্থল হইতে সংগৃহীত হইয়া আমাদের এই ধারণার প্রতি ইঙ্গিত দেয়। পরবর্তীকালে ব্যবহৃত মসৃণ কুঠারগুলির পুরাতন উপযোগিতা সম্বন্ধে আজ আমরা বিস্মৃত, বর্তমানে এই নিদর্শনগুলি পতণ্ডা, বাতিকর, ভীমগড় প্রভৃতি স্থানে গ্রামদেবতার প্রতিভূ স্বরূপ বা শিবলিঙ্গের 'অর্ঘ্যপট্টের' অংশবিশেষ রূপে পরিগণিত। বোলপুর থানার অন্তর্গত মহিষদল ও দেউলী, নান্নুর থানার অন্তর্গত চণ্ডীদাস-নান্নুর, কীর্ণাহার ও বেলুটি, ইলামবাজার থানার অন্তর্গত মুন্দিরা, সিউড়ী থানার অন্তর্গত হারাইপুর এবং ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত কোটাসুর প্রভৃতি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ও অন্বেষণের ফলে পশ্চিমবাঙ্গালার তাম্র-প্রস্তর যুগের গ্রামীণ সংস্কৃতির এক পটভূমি রচিত হইয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক আপাততঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে তাম্র-প্রস্তরযুগের এই সমস্ত গ্রামভিত্তিক কেন্দ্রগুলির বিকাশ খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮০ অব্দে সাধিত হয়। সেই প্রাচীন যুগ হইতেই এই অঞ্চলে বাঁশের বা কঞ্চির উপর মৃত্তিকা লেপনপূর্বক গৃহ নির্মাণ পদ্ধতির ধারা আবহমানকাল ধরিয়া অনুসৃত হইতে দেখা যায়। মহিষদল ইত্যাদি স্থানে খননকার্যের ফলে গৃহ-নির্মাণের উপকরণ ব্যতীত আমাদের অন্যকিছু তথ্য জানা সম্ভবপর হয় নাই, তৎকালীন বাস্তু-নক্সা ইত্যাদি সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ। এই স্থানে উৎখননের মাধ্যমে প্রাপ্ত একটি বাস্তবধর্মী মৃন্ময়-লিঙ্গ আকৃতির প্রত্নবস্তু সম্ভবতঃ সমকালীন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। আদি ঐতিহাসিক যুগে লিঙ্গ পূজার যে উৎপত্তি এখানে দেখা যায় পরবর্তীকালে এই লিঙ্গপূজা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েক শতাব্দী পূর্বে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অসংখ্য শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া শৈব ধর্মের প্রচার এবং মাহাত্ম্যকে ব্যক্ত করে। এই সঙ্গে মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ বিভিন্ন অলংকৃত ফলকাদি শিল্পীর ভাস্কর্য-শৈলীরও যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে ও সমকালীন জনমানসের ধ্যান-ধারণার পরিচয় দেয়।

এখন স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে যে এই সমস্ত সভ্যতা বাঙ্গালাদেশে কাহাদের মাধ্যমে সবিশেষ বিস্তার লাভ করে। এই বিষয়ে পণ্ডিতগণের

মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। আমাদের দেশের প্রাচীনতম সাহিত্যের মধ্যে বাঙ্গালাদেশের এই সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যদেশের আর্যদের নিকট 'অপাংক্তেয়' রূপে গণ্য করা হইয়াছে। তথাপি মহাভারতের কাহিনী, রামায়ণের রাম-সীতার বিভিন্ন স্থানে উপস্থিতি, রামায়ণ-মহাভারত এবং পুরাণোক্ত প্রসিদ্ধ মুনি-ঋষিগণের আশ্রমের অবস্থিতি সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত সেগুলি সম্ভবতঃ এই সমস্ত অঞ্চলে আর্যসভ্যতার বিস্তার এবং আর্যীকরণের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। রামায়ণ-মহাভারতের কিংবদন্তী যে অঞ্চলে বহুল প্রচলিত এবং যাহার প্রভাব জনসাধারণের মনে বিস্তার করিয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলে ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খননকার্য পরিচালিত হইলে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান মিলিতে পারে আশা হয়। সিউড়ীর নিকটবর্তী হারাইপুরে উৎখননের ফলে প্রাপ্ত শিশুকঙ্কালগুলির বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদিত হইলে বাঙ্গালার প্রাচীন জনতত্ত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করিবে সন্দেহ নাই।

পরবর্তীকালের অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধ ও জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের আবির্ভাবের সময়ে এ অঞ্চলের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। কেবলমাত্র জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের রাঢ়দেশ পরিভ্রমণ সম্বন্ধে আমরা অবহিত। 'আচারাঙ্গ সূত্রে'র বর্ণনায় সমকালীন রাঢ়দেশের অধিবাসীদের সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর বা পরবর্তী-কালে কোন জৈন ধর্ম প্রচারকগণের এই অঞ্চলে পরিভ্রমণের কাহিনী 'আচারাঙ্গ সূত্রে'র মধ্যে নিহিত আছে। বুদ্ধদেবের রাঢ়দেশ পরিভ্রমণ সম্বন্ধে কিংবদন্তী এবং জনশ্রুতির সমর্থন ধর্মপূজার আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি অনুসন্ধানকালে ডঃ অমলেন্দু মিত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। মৌর্য-শুঙ্গ যুগে বীরভূম অঞ্চলের কোন উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। মৌর্যযুগে প্রচলিত অঙ্কচিহ্নযুক্ত রৌপ্য মুদ্রা (*Silver Punch-marked Coins*) এবং কুষাণ ও গুপ্ত নরপতিগণের দ্বারা প্রচলিত মুদ্রা বীরভূমের কয়েকটি অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইলেও এই সমস্ত রাজবংশের আধিপত্যের প্রভাব খুব বেশী নজরে আসে না। পালপর্বে বীরভূম অঞ্চল প্রসিদ্ধি লাভ করে। মহীপালের স্মৃতি উত্তর-পূর্ব বীরভূমে এখনও বিদ্যমান। পাইকোড় গ্রামের অনতিদূরে ননগড়গ্রামে এক বিরাট দীঘি মহীপালের স্মৃতি বহন করে এবং নয়পালের সহিত গ্রামটির যোগাযোগ ছিল জনশ্রুতি আছে। চেদীরাজ কর্ণের সহিত এই অঞ্চলের যোগাযোগের প্রমাণ ত পাইকোড়ে

প্রাপ্ত কর্ণদেবের নামাঙ্কিত শিলালেখের মাধ্যমে ব্যক্ত। বৌদ্ধ পালরাজ-গণের রাজত্বকালে বৌদ্ধ দেব-দেবী অর্চনার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বারা, ভদ্রপুর, আকালীপুর, দেবগ্রাম ইত্যাদি স্থানে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ দেব-দেবী মূর্তির মধ্যে প্রতিফলিত। অপূর্ব সুষমামণ্ডিত তান্ত্রিক বজ্রযানী বৌদ্ধ-দের অর্চিত এই সমস্ত দেব-দেবীর মূর্তি বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা ব্যক্ত করে। দেব-দেবীর মূর্তিগুলি যে সমস্ত দেবায়তনে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেইগুলি পরবর্তীকালে বিধর্মীদের অত্যাচারের ফলে এবং কালের কুটিল প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত, কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট নাই। তথাপি এই সমস্ত অঞ্চলে ব্যাপক সমীক্ষা ও অন্বেষণের ফলে বৌদ্ধ প্রত্নকীর্তি সম্বন্ধে নূতন কোনও তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে আশা হয়।

রামপালের 'সামন্তচক্রে'র মধ্যে কয়েকটি সামন্ত রাজার বর্তমান বীরভূমের সীমানা বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিতির সংবাদ পাওয়া যায় সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত 'রামচরিতে'।

সেনপর্বের প্রারম্ভ হইতে বীরভূমে সেনরাজগণের আধিপত্য বিস্তারের কাহিনী সম্বন্ধে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, ঐতিহাসিক প্রমাণাদিও এই সম্পর্কে কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইয়া জনশ্রুতিকে সমর্থন করে। কোনও কোনও পণ্ডিতমহলের ধারণা যে 'আইন-ই-আকবরী'র মতে বল্লাল সেনই প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণসেনের নামানুসারে লক্ষ্মণাবতী ও লক্ষ্ণৌর নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। 'লক্ষ্ণৌর' বা প্রাচীন 'নগর' বীরভূমের বর্তমান রাজনগর হইতে অভিন্ন ইহা পণ্ডিতমহলের ধারণা। সেন নৃপতি বিজয়সেনের নাম ক্ষোদিত মূর্তি পাইকোড় হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পাল ও সেন পর্বের শিল্প-শৈলী অনুসারে নির্মিত বেশ কয়েকটি প্রস্তর-মূর্তি বীরভূম জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্বোক্ত বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি ব্যতীত এই সকল মূর্তিগুলির মধ্যে বিষ্ণু এবং উমা-মহেশ্বরের যুগলমূর্তির আধিক্যই পরিলক্ষিত হয় এবং সমকালীন ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই বীরভূম অঞ্চল মুসলমানদের করতলগত হয়। কালক্রমে রাজনগর বা নগরে তাঁহাদের শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান আধিপত্যের নিদর্শন রাজনগরের জীর্ণ পুরাকীর্তির মধ্যে দ্রষ্টব্য। এছাড়া নলহাটী থানার বারা, রামপুরহাট থানার মাড়গ্রাম, লাভপুর থানার সাউগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মসজিদ স্থাপনের দ্বারা ইসলামধর্ম প্রচারে মুসলমান গাজী ও পীরসাহেবগণ যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হন। এই সমস্ত

স্থানের মধ্যে বারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। নাসিরুদ্দীন মাহমুদ-শাহের রাজত্বকালে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে এবং বারবকশাহের রাজত্বকালে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভিন্ন ভিন্ন সময় বারায় দুইটি মসজিদ স্থাপনের কাহিনী শিলালেখ হইতে অবগত হওয়া যায়। মসজিদগুলির কোন চিহ্ন বর্তমানে নাই। মাড়গ্রামে জাফর খাঁ গাজীর দেহের এক অংশ সমাহিত হয় স্থানীয় জনশ্রুতি আছে। সাউগ্রামে ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এক মসজিদ নির্মাণের উল্লেখ শিলালিপির মাধ্যমে ব্যক্ত হইয়াছে। সুলতান হোসেন শাহ কর্তৃক বীরভূমের মধ্য দিয়া বিস্তৃত 'বাদশাহী সড়কে' ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে এক কূপ খননের উল্লেখ শিলালিপির মাধ্যমে পাওয়া যায় (*J. A. S. B. Vol XXX, Nos I-IV, 1861, pp389-90* এবং *List No: 111-p-60, in the 'Bibliography of Muslim Inscriptions in Bengal' by A. H. Dani* দ্রষ্টব্য)। সম্ভবতঃ বীরভূম সীমান্তের সন্নিকটে অবস্থিত 'বাদশাহী সড়কে'র পার্শ্বে দণ্ডায়মান কেতুগ্রাম থানার (বর্ধমান জেলা) অন্তর্গত কুলুটিয়া গ্রামের জীর্ণ মসজিদের প্রতি এই শিলালিপিটি ইঙ্গিত করে। শামসুদ্দীন আহমদ সঙ্কলিত '*Inscriptions of Bengal, Vol-IV*' গ্রন্থের ২৭১ এবং ২৭৬-২৭৭ পৃষ্ঠায় বীরভূমের শেরপুরে সম্রাট শাহজাহানের আমলে দুইটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ শিলালিপির মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়। শেরপুর মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজার হইতে ১৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এই শেরপুর বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত শেরপুর-আতাই নামে প্রসিদ্ধ স্থান যে স্থানে মানসিংহের সহিত ওসমান খানের যুদ্ধ হয়।

বীরভূমের পুরাকীর্তিগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাচীন কীর্তি রাজনগরের 'মতিচূড়া মসজিদে'র নির্মাণকাল সম্বন্ধে কোন সন-তারিখ বা জনশ্রুতির সমর্থন পাওয়া যায় না। স্থাপত্য ও শিল্প-শৈলী দেখিয়া অনুমিত হয় যে মসজিদটি ষোড়স শতাব্দীতে নির্মিত। এই মসজিদের ইষ্টকগাত্রে উৎকীর্ণ অলঙ্করণের ধারা পরবর্তীকালের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মন্দিরগুলির গাত্রে রূপায়িত হয়।

• বীরভূমের মন্দিরগুলির মধ্যে প্রাচীনতম মন্দির (খ্রীষ্টীয় ১৬৩৩ অব্দে প্রতিষ্ঠিত) ইলামবাজার থানার অন্তর্গত ঘুরিষা (শ্রীপুর) গ্রামের রঘুনাথজীর চার-চালা ইষ্টকনির্মিত মন্দির। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ অন্যান্য বিষয়বস্তুর মধ্যে শাক্ত বা তন্ত্রোক্ত মহাবিদ্যাদেবীগণের প্রতিকৃতির রূপায়ণ বীরভূমে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানাদির প্রচলিত মতকেই

সমর্থন করে। এই মন্দির প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসর পরেই রাজনগর থানার কবিলাসপুরে ১৫৬৫ শকাব্দে (খ্রীষ্টীয় ১৬৪৩ অব্দে) হরি মন্দির (বিষ্ণু) স্থাপনের উল্লেখ এইস্থানে মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপির মাধ্যমে পাওয়া যায়। এই মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপির মধ্যে ঐ অঞ্চলের সমকালীন মুসলমান শাসকের দীর্ঘায়ু কামনা করা হইয়াছে। বীরভূমে এই সময় রাজনগরের মুসলমান ফৌজদারগণের আধিপত্য ছিল। রাজনগর রাজগণের হিন্দু মন্দিরাদিতে প্রতিষ্ঠিত দেব বিগ্রহ পূজা অর্চনার জন্য বৃত্তিদানের দৃষ্টান্ত পুরাতন নথিপত্র হইতে পাওয়া যায়। মন্দির নির্মাণে 'মেহতরি হরিদাস' নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ বিশেষ চিত্তাকর্ষক। বীরভূমের নানুর থানার অন্তর্গত চারকলগ্রামের ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দালান মন্দিরের স্থপতিরূপে সাওতা নিবাসী শ্রীগোপীনাথ রাজের নাম "বাংলার মন্দির: মন্দিরগড়া স্থপতিদের ঠিকানা" শীর্ষক প্রবন্ধে তারাপদ সাঁতরা উল্লেখ করিয়াছেন ('চতুষ্কোণ' ফাল্গুন ১৩৭৬ সংখ্যার পৃঃ ১০৩৫-১০৪৭ প্রকাশিত)। ইহা ব্যতীত থুপসরা গ্রামের মন্দির, লাভপুর গ্রামের বিভিন্ন সময়ে নির্মিত দুইটি আটচালা মন্দির এবং এই একই গ্রামের অপর একটি শিখর মন্দির নির্মাতা স্থপতিগণের নাম উপরোক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে। অবশ্য এই প্রবন্ধে উল্লিখিত বীরভূমে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরগুলির যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইতে জানা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সমস্ত মন্দিরগুলির স্থপতিগণের নিবাস বর্ধমান জেলার গুসকরা, কেতুগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। পূর্বে উল্লিখিত কবিলাসপুরের মন্দিরের শিলালিপিতে বর্ণিত হরিদাস সম্ভবতঃ মেহতর-হাড়ি শ্রেণীর লোক এবং এই মন্দির নির্মাণে সক্রিয় সহযোগিতার জন্য তাঁহার নাম উল্লেখ আছে। মুকুল দে তাঁর '*Birbhum Terracottas*' গ্রন্থে ইলামবাজার হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত জন্নুবাজার গ্রামে হাড়ি, বাগদী বা হাজরা এবং বৈরাগী শ্রেণীর শিল্পীদের অবস্থিতি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন (পৃঃ ১৪ দ্রষ্টব্য)। বীরভূমের মন্দির স্থাপত্যে বাঙ্গালার এই অন্ত্যজ শ্রেণীর হিন্দুদের অবদান এখন যথার্থ স্বীকৃত। (লেখক কর্তৃক রচিত "বীরভূমের মন্দির স্থপতি প্রসঙ্গে" শীর্ষক প্রবন্ধ 'আসর পত্রিকা' একুশ বর্ষ, নববর্ষ সংখ্যা; বৈশাখ ১৩৭৭ প্রকাশিত দ্রষ্টব্য।)

বীরভূম অঞ্চল মুসলমান অধিকারে থাকাকালীন তৎকালীন রাজশক্তির এই অঞ্চলে মন্দির-মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার দৃষ্টান্ত উৎকীর্ণ শিলালিপি ও পুরাতন নথিপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। মসজিদ নির্মাণে

সমকালীন নবাব বাদশাহগণের পৃষ্ঠপোষকতার কাহিনী আরবী ও ফারসী ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপির মাধ্যমে ব্যক্ত হইয়াছে। রাজশক্তির এই সক্রিয় সহযোগিতা থাকিলেও বীরভূমের একমাত্র রাজনগরের 'মতিচূড়া মসজিদ' ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন মসজিদের স্থাপত্য শিল্প দর্শনীয় নয়, এমনকি শিলালিপিতে বর্ণিত মসজিদের চিহ্ন পর্যন্ত অবলুপ্ত।

বীরভূমে বাঙ্গালার মন্দিরসমূহের এ পর্যন্ত যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলির অধিকাংশই সাধারণ পল্লীবাসী বা গ্রামস্থ ভূম্যধিকারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সামান্য কয়েকটি মন্দির অবশ্য উচ্চপদে নিযুক্ত রাজপুরুষগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা ঐ সমস্ত মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপির মাধ্যমে জানিতে পারা যায়। করণ (কায়স্থ) রূপদাস কর্তৃক কবিলাসপুরের হরি (বিষ্ণু) মন্দির, মুর্শিদাবাদের দেওয়ান রামনাথ ভাদুড়ী কর্তৃক ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ভাণ্ডীরবনের অত্যুচ্চ ইষ্টক নির্মিত ভাণ্ডীশ্বর শিব মন্দির, বক্রেশ্বর মন্দিরের অংশবিশেষ রাজনগর রাজের মন্ত্রী দর্পনারায়ণ কর্তৃক ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইবার কাহিনী ইত্যাদি মন্দির নির্মাণে অর্থ প্রাচুর্যের প্রয়োজনীয়তার কথাই ব্যক্ত করে। বীরভূমের প্রাচীনতম মন্দির যথা ঘুরিষার (শ্রীপুর) রঘুনাথজী মন্দির নির্মাণে গ্রামস্থ পণ্ডিত ৺রঘুত্তম ভট্টাচার্যের অবদানই মুখ্য। মন্দিরটি আদিতে রঘুনাথজীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত হইলেও মন্দিরগাত্রে শৈব-শাক্ত ভাবাপন্ন দেব-দেবীর মৃৎফলকের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণ শিল্পীর শিল্পৈষণার যথেষ্ট পরিচয় দেয়। মৃৎ-ফলকগুলির মধ্যে ছিন্নমস্তা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যাদেবীগণের উপস্থিতি লক্ষণীয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সম্পাদিত 'তন্ত্রসার' সংগ্রহে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলা প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণের সাধনবিধিও সঙ্কলিত হইয়াছে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে "এই সমুদয় দেবীকে অবলম্বন করিয়া বাংলায় তন্ত্র সাধন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।" (পৃঃ ২৯৫ 'বাংলাদেশের ইতিহাস'-মধ্যযুগ; ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত দ্রষ্টব্য।) সম্ভবতঃ 'তন্ত্রসার' সংগ্রহ প্রকাশের পর বীরভূমে দশমহাবিদ্যাগণের আরাধনার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। অর্বাচীনকালের পুরাণ-তন্ত্রাদি গ্রন্থে যথা, 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণ', 'চামুণ্ডা তন্ত্র', 'মুণ্ডমালা-তন্ত্র' 'মালিনী বিজয়', 'পীঠ-নির্ণয়, 'তন্ত্রচিন্তামণি' ইত্যাদিতে দশমহাবিদ্যাগণের বিভিন্ন নামের উল্লেখ আছে। 'গুহ্যাতি গুহ্যতন্ত্রে' বিষ্ণুর দশাবতারগণের সহিত দশমাতৃকা মূর্তির বর্ণনা দশমহাবিদ্যাদেবীগণেরই নামান্তর এবং সম্ভবতঃ বিষ্ণুর

দশাবতার ধ্যান-ধারণার সহিত মধ্যযুগের শেষভাগে শাক্ত ধ্যান-ধারণার সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টারূপে গণ্য করা যায়। (*Note I at p-48 of the article entitled 'The Sakta Pithas' by D. C. Sircar, J. R. A. S. B. Letters; Vol XIV, No 1, 1948* দ্রষ্টব্য।) প্রাচীনকালে বীরভূমে তান্ত্রিক প্রভাব বজ্রযানী বৌদ্ধদের মাধ্যমে সবিশেষ প্রসার লাভ করে এবং তাহার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণও বীরভূমে প্রাপ্ত বজ্রযানী বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তিসমূহ হইতে পাওয়া যায়। পীঠস্থানসমূহের কিংবদন্তী মধ্যযুগের শেষভাগে সবিশেষ প্রাধান্য পায় এবং 'পীঠনির্ণয়' ইত্যাদি তন্ত্র এই সময়ে রচিত হইয়া জনমানসে ঐ সমস্ত তন্ত্রমধ্যে বর্ণিত স্থানের মাহাত্ম্য প্রচার ও দেব-দেবীগণের প্রতি ভক্তিরসের সঞ্চার করে। বীরভূমে বেশ কয়েকটি পীঠস্থানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা অবহিত এবং যথাস্থানে সেগুলি আলোচিত হইবে।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি-পত্রাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে 'পীঠনির্ণয় তন্ত্র', 'শিবচরিত' এবং ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণিত বাংলাদেশের পীঠস্থানগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা সম্ভবতঃ সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের পূর্বে হয় নাই। প্রাচীন অন্য কোন গ্রন্থে এই সমস্ত পীঠস্থানগুলির উল্লেখ নাই। (ডঃ সরকার রচিত '*The Sakta Pithas*' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের বহুল প্রচার ও প্রসারের ফলে বীরভূমের শক্তিসাধকগণ তাঁহাদের প্রাধান্য স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে এই জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন শাক্ত পীঠস্থানগুলির মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হন। সাহিত্য ও জনশ্রুতির মাধ্যমে এই সমস্ত পীঠস্থানগুলি তাহাদের মাহাত্ম্যপ্রচার পূর্বক জনমানসে আপনস্থান অধিকার করিয়া লয়। এতদসত্ত্বেও শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে সমন্বয় আমরা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের জন্মস্থানের নিকটবর্ত্তী বীরচন্দ্রপুরে এবং বোলপুরের অনতিদূরে অবস্থিত মুলুক গ্রামে শ্রীশ্রীরামকানাই ঠাকুরের শ্রীপাটে একই স্থানে বৈষ্ণব ও শাক্ত দেবদেবী অর্চনার মধ্যে রূপায়িত দেখিতে পাই।

বীরভূমের মন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য: বীরভূমের মন্দির স্থাপত্য এবং তাহার অলঙ্করণ বাঙ্গালার মন্দির স্থাপত্য-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বাঙ্গালার সমাজ বিবর্তনের ও বাঙ্গালীর মনস্বিতার ও ভাবপ্রবণতার চিত্র এই মন্দির ভাস্কর্যের মধ্যে প্রতিফলিত। মধ্যযুগে রচিত বাঙ্গালার মঙ্গলকাব্য এবং পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে সমকালীন

বাঙ্গালার সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্য আহরণ করা যায়। "কিন্তু পটভূমির প্রসারে, কল্পনার বিস্তারে এবং শিল্পসৃষ্টির দক্ষতায় বাংলার মন্দির শিল্পকে সমসাময়িক যুগের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম দলিল বলে অভিহিত করা চলে। বাংলার মন্দির বাঙ্গালীর জাতীয় তীর্থ। বাঙ্গালীর অন্তর হৃদয়ের পরিচয় দিতে, তার স্পর্শশীলতার, তার আনন্দ-বেদনার এবং সর্বোপরি তার আধ্যাত্মিক অনুভূতির ইঙ্গিতে বাংলার দেবদেউল-গুলি একান্তই অপ্রতিদ্বন্দ্বী" (কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'বাংলার দেব দেউল' শীর্ষক প্রবন্ধ, পৃঃ ৬০৩-৬১১, অমৃত 'পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যা' ৮ই পৌষ ১৩৭২ বঙ্গাব্দ দ্রষ্টব্য)। বীরভূমের মন্দির সম্বন্ধেও এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য।

কয়েকটি প্রস্তরনির্মিত মন্দির ব্যতীত বীরভূমের অধিকাংশ মন্দিরই ইষ্টকনির্মিত। যে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় এই সমস্ত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় তৎকালে এইগুলির নির্মাণে আশানুরূপ অর্থ সাহায্য রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয় নাই। সাধারণ ভূম্যধিকারী, পণ্ডিত, ব্যবসায়ী ইত্যাদিগণের দ্বারা অধিকাংশ মন্দিরই প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য যে কয়েকটি সুউচ্চ ইষ্টকনির্মিত মন্দির এখনও দণ্ডায়মান আছে সেগুলির নির্মাণকার্য উচ্চ শ্রেণীর রাজকর্মচারী বা উচ্চ জমিদার শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। দেওয়ান রামনাথ ভাদুড়ী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভাণ্ডীর-বনের ভাণ্ডীশ্বর শিবমন্দির, ঢেকার রামজীবন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলেশ্বর শিবমন্দির বীরভূমের ইষ্টকনির্মিত সুউচ্চ সৌধরূপে গণ্য করা চলে। ডাবুক গ্রামের অত্যুচ্চ ডাবুকেশ্বর শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা সাধক কৈলাসপতির দ্বারা সাধিত হইলেও মন্দির প্রতিষ্ঠায় লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ের জনশ্রুতি আছে। সে অর্থ জনসাধারণ কর্তৃক প্রদত্ত হইলেও ইহাই ধারণা হয় যে সুউচ্চ সৌধ নির্মাণ অর্থের প্রাচুর্য ভিন্ন সম্ভব নহে। ইহা ব্যতীত ইষ্টকের দ্বারা সুউচ্চ সৌধ নির্মাণে স্বাভাবিক কারণে অনেক অসুবিধা আছে এবং অনেক কৌশল অবলম্বনেরও প্রয়োজন।

উত্তর ভারতের 'নাগর রীতি'র অনুসরণে নির্মিত 'রেখ-দেউলে'র প্রস্তরনির্মিত নিদর্শন এ পর্যন্ত বীরভূমে মাত্র কয়েক স্থানে আছে। রাজনগর থানার কবিলাসপুরে, সদ্য আবিষ্কৃত সিউড়ী থানার মহুলায় এবং খয়রাশোল থানার পাঁচড়ায় এই শ্রেণীর মন্দির আছে। বীরভূমের মন্দির স্থাপত্য-শৈলীতে উপরোক্ত প্রস্তরনির্মিত 'রেখ-দেউলের' মধ্যে এক সম্পূর্ণ নূতন স্থাপত্য রীতি অনুসৃত হইয়াছে। মন্দিরের ভিত্তিবেদীর উপর হইতে শিখরগুলি কৌণিক রেখা অবলম্বন

পূর্বক উদ্গত, শিখরের দুই প্রধান অঙ্গরূপে সূচিত 'বাড়' ও 'গণ্ডীর' মধ্যে কোন বিভেদ লক্ষণীয় নয়। সম্পূর্ণরূপে ওড়িশা রীতির রেখ-দেউলের অনুকরণ খয়রাশোল থানার রসা ও পাশুণ্ডীর প্রস্তর মন্দির এবং দুবরাজপুর থানার বক্রেশ্বরের প্রসিদ্ধ বক্রনাথ বা বক্রেশ্বর শিবমন্দিরে দেখা যায়। যদিও 'ভবিষ্য পুরাণে'র 'ব্রহ্মাণ্ড অধ্যায়ে' বক্রেশ্বর তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তথাপি বর্তমান মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ লিপিসমূহ হইতে অবগত হওয়া যায় মন্দিরের বিভিন্ন অংশ ১৬৭৭, ১৬৮১ এবং ১৬৮৩ শকাব্দে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে নির্মিত হয়। রসা এবং সমসাময়িক কালের পাশুণ্ডীর মন্দিরগুলি ইহার প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে নির্মিত হয়। রসার মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ প্রতিষ্ঠাফলক এবং পাশুণ্ডী মন্দিরের স্থাপত্য-শৈলী ইহাই সাক্ষ্য দেয়। পাঁচড়া গ্রামের রেখ-দেউলের সহিত একটি একবাংলা মণ্ডপ সংযুক্ত হইয়া মন্দিরটির সৌষ্ঠব বর্ধন করিয়াছে।

ভাণ্ডীরবনের সুউচ্চ ইষ্টকনির্মিত ভাণ্ডীশ্বর শিবমন্দিরে এই একই স্থাপত্যশৈলী অনুসৃত হয়। মন্দিরটির প্রবেশ দ্বারের উপর পত্রাকৃতি খিলান আছে। ডাবুক গ্রামের অত্যুচ্চ ডাবুকেশ্বর শিবমন্দিরটি একটি অত্যুচ্চ চালারীতির মন্দির ; এটিকে সম্ভবতঃ বীরভূমের উচ্চতম মন্দির রূপে গণ্য করা যায়। মন্দিরটির উচ্চতার আধিক্য হেতু মন্দিরটিকে হঠাৎ দেখিলে রেখ-দেউলরূপে ভ্রম হয়।

বীরভূমে কুটিরাকৃতি চার-চালা রীতির মন্দিরের আধিক্য লক্ষণীয়। ঘুরিষা (শ্রীপুর), গণপুর, রামনগর, জুবুটিয়া, উচকরণ, ছিনপাই, বক্রেশ্বর মল্লারপুর, খরবোনা, তেজহাটি, মেহগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে এই শ্রেণীর মন্দির স্থাপত্য লক্ষ্য করা যায়। ঘুরিষার (শ্রীপুর) রঘুনাথজী মন্দিরটি বীরভূমে এ পর্যন্ত প্রাচীনতম মন্দিররূপে পরিগণিত এবং এখানের মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ ফলকগুলির শিল্প-শৈলীর মধ্যে সজীবতার ভাব লক্ষণীয়। লৌহ ব্যবসাসূত্রে 'লোহা মহলের' অন্তর্গত গণপুর গ্রাম এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে, তৎকালীন সমৃদ্ধি এই গ্রামের মন্দির সংস্থানগুলির মধ্যে প্রতিফলিত। এখানের এবং নিকটবর্তী মল্লারপুর গ্রামের মন্দির গাত্রে 'ফুলপাথরের' উপর উৎকীর্ণ ভাস্কর্যসমূহ দর্শনীয়।

আট-চালা রীতির মন্দিরের মধ্যে সিউড়ীর সোনাতোড়পাড়ায় অবস্থিত রাধাদামোদর মন্দিরের শিল্প-শৈলী অপূর্ব। এইখানে ফুলপাথরের ফলকের মাধ্যমে বিভিন্ন দৃশ্যাবলী মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ দেখা যায়। গণপুর গ্রামের অন্য মন্দিরগুলি ব্যতীত একটি জীর্ণ আট-চালা

মন্দিরেও এই ফুলপাথরের কাজ লক্ষ্য করা যায়। তারাপুরের (তারা-পীঠের) তারা দেবীর মন্দিরও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং ঐ মন্দিরের প্রবেশ পথের উপর ফুলপাথরে বিভিন্ন দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ। নান্নুরের বাসলী মন্দির সংলগ্ন দুইটি আট-চালা শিব মন্দির, দাসকলগ্রাম, বালিগুনী এবং লাভপুরের 'ফুল্লরা পীঠ' সংলগ্ন এক মন্দির ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

'নবরত্ন' মন্দিরের মধ্যে জয়দেব-কেন্দুলীর রাধাবিনোদ মন্দিরটির সম্মুখের খিলানের উপর সুন্দর কারুকার্য দেখা যায়। ব্রাহ্মণডিহির নবরত্ন মন্দির এখন জীর্ণ অবস্থায় আছে, মন্দিরের চতুর্দিকে মণ্ডপের অবস্থিতি এই মন্দিরের বিশেষত্ব। সম্প্রতি এই ধরণের এক মন্দিরের সন্ধান অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চারকলগ্রামে (নানুর থানা) পাইয়াছেন। ঘুরিষা গ্রামের নবরত্ন গোপাললক্ষ্মী মন্দিরের সম্মুখে সমতল ছাদ বিশিষ্ট মণ্ডপের সংযোজন এবং মন্দির গাত্রে বিদেশী বেশ-ভূষায় সজ্জিত বিদেশীয় নরনারীর উপস্থিতির বিশেষত্ব লক্ষণীয়।

'পঞ্চরত্ন মন্দিরে'র সংখ্যাও বীরভূমে কিছু আছে। সুরুলের এবং ইলামবাজারের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির এই সমস্ত মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

দুবরাজপুরে 'ত্রয়োদশরত্ন' মন্দিরের কয়েকটি নিদর্শন বর্তমান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে অজয়-তীরবর্তী গ্রামসমূহ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। সুরুল, ইলামবাজার, সুপুর প্রভৃতি গ্রামে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ক্ষুদ্রাকার ইষ্টকনির্মিত 'দেউল' প্রতিষ্ঠিত হয়।

অষ্টকোণাকৃতি 'দেউল' যথা সুপুর, ইলামবাজার প্রভৃতি স্থানের মন্দিরগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত হয়। হেতমপুরের অষ্টকোণাকৃতি চন্দ্রনাথ শিবমন্দিরটির প্রতি অঙ্গে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বিদ্যমান। স্থানীয় কুঠিয়ালদের প্রভাবে এবং পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার সংস্পর্শে আসিবার ফলে এই মন্দিরটির স্থাপত্যে এবং ভাস্কর্যে ইউরোপীয় প্রভাব পরিস্ফুট। সুরুলে অবস্থিত ইংরাজ কুঠিয়াল জন চীপ তাঁহার অবস্থিতি কালে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। হান্টারের বিবরণ হইতে জানা যায় যে চীপ সাহেব জনগণের অশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেন। সমকালীন মন্দিরগুলিতে এজন্য ইউরোপীয় সমাজ জীবনের চিত্র প্রতিফলিত। মন্দির শীর্ষোপরি গীর্জার উপরে প্রতিষ্ঠিত দেবদূতগণের ন্যায় দণ্ডায়মান প্রতিকৃতি, আইয়োনীয় অর্ধস্তম্ভ

ইত্যাদি সমস্তই ইউরোপীয় প্রভাবের ফল। ইলামবাজারের লক্ষ্মী-জনার্দন মন্দির-ভাস্কর্যের মধ্যে এই ইউরোপীয় স্থাপত্যের নিদর্শন দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জোড়বাংলা রীতির মন্দিরের নিদর্শন বীরভূমে মাত্র এক স্থানে দেখা যায়। বোলপুর থানার অন্তর্গত ইটাণ্ডায় এই রীতির মন্দির জীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান। মুরারই থানার মিত্রপুরে জোড়বাংলা রীতির মন্দিরের অবস্থিতি এখন কিংবদন্তীতে পর্যবসিত।

সমতল ছাদযুক্ত দালান মন্দিরও বীরভূমের মুলুক, পেরুয়া এবং গোপালপুরে দেখা যায়। গোপালপুরের মন্দিরগুলি আবার দ্বিতল এবং সর্বোপরি একবাংলা রীতির ক্ষুদ্রায়তন প্রদীপ গৃহ সন্নিবেশিত।

বীরভূমের মন্দিরগুলির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবীর মধ্যে দুই একটি ক্ষেত্র ব্যতীত প্রায় সর্বত্রই সর্বংসহ চিহ্ন মাত্রে পর্যবসিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। অনাদিলিঙ্গ শিবের 'স্বয়ম্ভু' রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার কাহিনীও কোন কোন গ্রামে শুনা যায়। কিন্তু মন্দিরগাত্র অলঙ্করণে মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবীর সহিত জড়িত আখ্যানবলীই যে প্রাধান্য পাইয়াছে তাহা নয়। মন্দিরগাত্রে রামায়ণের কাহিনী এবং কৃষ্ণলীলার ঘটনাবলী ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। 'মঙ্গলকাব্যে' বর্ণিত উপাখ্যানেরও কিছু কিছু চিত্র উৎকীর্ণ দেখা যায়। এই যুগে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন, জনমানসে রামায়ণ অসীম প্রভাব বিস্তার করে, শিল্পীমনও রামায়ণের কাহিনী শ্রবণ পূর্বক ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। রামায়ণের রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্যই মন্দিরগাত্রে মুখ্য স্থান অধিকার করে। এই যুদ্ধের মাধ্যমে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার মর্মবাণী জনসমক্ষে ব্যক্ত হইয়াছে। ইউরোপীয় প্রভাবের শিল্প ধারায় মণ্ডিত সিংহাসনে উপবিষ্ট রামসীতার সপারিষদ উপস্থিতি ক্রমশঃ রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্যের স্থান অধিকার করে। বীরভূমে শাক্ত দেব-দেবী পূজার আধিক্যের জনশ্রুতি প্রচলিত রহিলেও মাত্র কয়েকটি স্থানে মন্দির গাত্রে তন্ত্রে বর্ণিত দেব-দেবীর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। ঘুরিষার 'রঘুনাথজী' মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ দেবী মূর্তিগুলি মূর্তিতত্ত্বের বিচারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সপরিবারে দুর্গা-মহিষাসুরমর্দিনী বা চণ্ডীর প্রতিকৃতির ফলকের মাধ্যমে রূপায়ণ স্থানীয় ধর্মভাব এবং জনশ্রুতিকে ব্যক্ত করে।

দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীও কোন কোন স্থানে রূপায়িত হইয়া সমকালীন সমাজের এক চিত্র আমাদের নিকট প্রতিভাত। উৎসব, পূজাপার্বণ, যুদ্ধযাত্রা, শিকার ইত্যাদির দৃশ্যাবলীর মাধ্যমে মন্দির ফলকগুলি অলঙ্কৃত হইয়া সমাজের বিভিন্ন রূপ আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত। মন্দিরের ভিত্তিবেদীর উপরে নিবিষ্ট ফলকে সাধারণতঃ এই সমস্ত দৃশ্যগুলি উৎকীর্ণ থাকিত। মন্দির ফলকগুলির রূপায়ণ দেখিয়া ধারণা জন্মে স্থানীয় জনসাধারণ বা দূরাগত তীর্থযাত্রী সকলেই মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ দৃশ্যাবলীর বিষয়বস্তুর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। অধিকাংশ জনসাধারণ অশিক্ষিত বা নিরক্ষর রহিলেও গ্রামের দেবমন্দির বা চণ্ডীমণ্ডপে কথকতা বা রামায়ণ গানের মাধ্যমে তাঁহারা রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা এবং অন্যান্য পৌরাণিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। উৎকীর্ণ দৃশ্যাবলীর কাহিনী হৃদয়ঙ্গমে কোন অসুবিধা ছিল না। ধর্মস্থানের সৌধাবলীর বিভিন্ন দৃশ্যাবলীর মাধ্যমে অলঙ্করণ আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। বৌদ্ধস্তূপের চারি পার্শ্বে বেষ্টনীসমূহ অলঙ্করণের মাধ্যমে বুদ্ধদেবের জীবনকথা ব্যক্ত করিবার প্রচেষ্টা হইতে এই রীতি বিদ্যমান। দীঘলপটের উপর চিত্রিত রামায়ণ, কৃষ্ণলীলা, মনসামঙ্গলের কাহিনী ইত্যাদি বর্ণনা এবং সেগুলি লোকসঙ্গীতের মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রচার বীরভূম অঞ্চলে পূর্বে প্রচলিত ছিল। সেগুলির মাধ্যমে প্রচারও জনসাধারণকে মন্দির-ভাস্কর্য উপলব্ধি করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। পটুয়া শিল্প এবং সঙ্গীত এখন প্রায় লুপ্ত। বীরভূমের মন্দিরের ভাস্কর্যশিল্পের রস সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক কাহিনী এবং কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে রচিত সাহিত্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। পৌরাণিক এবং ধর্মগ্রন্থসমূহের আঞ্চলিক সংস্করণগুলি সম্বন্ধেও অবহিত হইতে হইবে নচেৎ ফলকগুলির খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু অপরিজ্ঞাত থাকিবে।

মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ দেব-দেবী এবং নর-নারীগণের বেশভূষা, অঙ্গসজ্জা ইত্যাদি সমকালীন সাহিত্যে অঙ্গসজ্জা বর্ণনার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ বিশেষ। গৃহবিন্যাসের উপকরণগুলিও এই ভাবে অলঙ্কৃত ফলকের মাধ্যমে মধ্যযুগের সাহিত্যকে সমর্থন করে। বীরভূমের মন্দির-স্থাপত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে এক সুসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করিয়া শিল্পীর শিল্পৈষণার যথেষ্ট প্রমাণ দ্বারা মধ্যযুগের শেষভাগের ইতিহাস ও সংস্কৃতির এক ধারাবাহিক চিত্র জনমানসে উদ্ঘাটন করে।

পুরাকীর্তি পরিচিতি

আকালীপুর ঃ নলহাটী থানার অন্তর্গত এবং পূর্ব রেলপথের নলহাটি-আজিমগঞ্জ শাখার লোহাপুর রেলষ্টেশন হইতে প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মহারাজা নন্দকুমারের জন্মস্থান ভদ্রপুর গ্রাম সংলগ্ন এই গ্রাম। গ্রামের দক্ষিণে মহারাজ নন্দকুমার প্রতিষ্ঠিত সর্পাসীনা, সর্পাভরণে ভূষিতা, বরাভয়দায়িনী দ্বিভুজা জগন্মাতা শ্রীশ্রীগুহ্যকালিকা দেবীর মূর্তি মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। মাঘ রটন্তী চতুর্দ্দশীতে মহাসমারোহে দেবীর পূজা সাধিত হয়। কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত দেবীমূর্তির প্রসন্নরূপ মনমুগ্ধকর। মূর্তিটি তান্ত্রিক উপাসনা পদ্ধতি অনুযায়ী 'যন্ত্র' বা 'মণ্ডলের' উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হয়। মন্দিরটি সুউচ্চ এবং ইষ্টকনির্মিত। অষ্টকোণাকৃতি এই মন্দিরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিবার পথ আছে। প্রদক্ষিণ পথের চারিধার আবার সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। মন্দিরের তিনটি প্রবেশদ্বার, মূলদ্বারটি দক্ষিণদিকে অবস্থিত এবং দেবী দক্ষিণাভিমুখী, এছাড়া পূর্ব ও পশ্চিম দিকেও তুইটি দ্বার আছে। মন্দিরের চৌকাঠগুলি ব্যাসাল্ট (*Basalt*) প্রস্তরে নির্মিত। জনশ্রুতি আছে যে এই মন্দির নির্মাণকালে অকস্মাৎ মন্দিরের চতুষ্পার্শ্ব বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং রাত্রে স্বপ্নাদেশে দেবী জ্ঞাপন করেন যে যেহেতু তিনি শ্মশানবাসিনী তাঁহার জন্য দেবায়তনের প্রয়োজন নাই। মন্দিরের উত্তর দিকের প্রাচীরে এক বিরাট ফাটল উপরোক্ত ঘটনার সাক্ষ্য দেয়; স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা। গুহ্যকালী দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা হইতে মহারাজ নন্দকুমারের শক্তিসাধনার কথা অনুমিত হয়। শ্যামা-সঙ্গীত রচয়িতা রূপেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মালীহাটীর সুপ্রসিদ্ধ রাধামোহন ঠাকুরের নিকট দীক্ষান্তে তিনি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবরূপে পরিগণিত হইলেও সকল দেবতা ও সকল সম্প্রদায়কে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন।

আকালীপুর গ্রামের উত্তরে 'ষষ্ঠীতলা' রূপে চিহ্নিত স্থানে বর্তমানে কয়েকটি ভগ্ন প্রস্তর মূর্তি পড়িয়া আছে। এইগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ এক কীর্তিমুখের ভগ্ন অংশটি দর্শনীয় ও চিত্তাকর্ষক। বিষ্ণু এবং উমা-মহেশ্বরের ভগ্নমূর্তিও এই স্থানে আছে। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর শিল্প-শৈলী অনুসরণে এই মূর্তিগুলি নির্মিত।

আঙ্গোরা : নানুর থানায় অবস্থিত এ গ্রামের প্রধান পুরাকীর্তি ইষ্টকনির্মিত, পূর্বমুখী, পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত, একদুয়ারী, দেউল রীতির এক শিবমন্দির। এটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ১০ ফুট ৩ ইঞ্চি (৩·১ মিটার) ও উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট (৯ মিটার)। শিখর সপ্তরথ ও খাঁজকাটা এবং ছাদ ধাপ পদ্ধতিতে নির্মিত। স্থানীয় বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের বর্তমান বংশধরদের ছয় পুরুষ পূর্বের ৺গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপুত্রক বিধবা পত্নী শ্রীযুক্তা হরঠাকরুণ প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী। মন্দিরটি অতএব আনুমানিক দেড় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন হওয়া সম্ভব। গর্ভগৃহে প্রবেশপথের উপরে বৃষবাহন শিব ও ষড়ভুজ কৃষ্ণ এবং দুই পার্শ্বে পৌরাণিক মূর্তিগুলির শিল্প-শৈলী আধুনিক ও স্থূল প্রকৃতির। (পূর্ত বিভাগের যুগ্ম-সচিব শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণের ভিত্তিতে এ নিবন্ধটি রচিত।)

আদিত্যপুর : বোলপুর থানার মধ্যে অবস্থিত এই গ্রাম শান্তিনিকেতন হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। এই গ্রামে একটি ক্ষুদ্র 'দেউল' আছে। পূর্বদুয়ারী প্রবেশ পথের উপর প্রতিষ্ঠাফলকে এই লিপি উৎকীর্ণ আছে :—

'শ্রীশ্রী ঈশ্বর মণ্ শকাব্দ ১৭৩৯ সাল
শ্রী ঈশ্বর রুদ্রায়ণ আচার্য্য।'

লিপিপাঠে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় জানা যায়। প্রবেশ-পথের উপর মৃৎফলকে সিংহাসনে উপবিষ্ট রাম-সীতার প্রতিমূর্তি উৎকীর্ণ। পার্শ্বে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, হনুমান প্রভৃতি দণ্ডায়মান। দ্বারের দুই পার্শ্বে এবং উপরে শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত ফলকগুলিতে পৌরাণিক কাহিনীসমূহ বর্ণিত এবং দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী রূপায়িত। দক্ষিণ পার্শ্বে এক নকলদ্বারের উপরিভাগে খিলানে আম্র-পল্লবের মধ্যে উপবিষ্ট গণেশের মূর্তি লক্ষণীয়। গণেশের দুই পার্শ্বে ময়ূর এবং শুক পাখীর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। চারিদিকের বনরাজী এবং তত্রস্থ পক্ষীগণের বিচরণ ক্ষেত্রের মধ্যে গণেশের অবস্থিতি সহজে নজরে আসে না।

গ্রামের লৌকিক দেবতারূপে পরিগণিত কাঞ্চীশ্বর শিব সারা বৎসর জলে নিমজ্জিত থাকেন, বৈশাখী পূর্ণিমায় জলমধ্য হইতে তুলিয়া আড়ম্বর সহকারে পূজা হয়। গ্রামের 'চাঁদরায়' নামে অভিহিত ধর্ম-ঠাকুরের আকৃতি মস্তকহীন মনুষ্যদেহের মত কথিত হয়।

ইটাণ্ডা : বোলপুর থানার অন্তর্গত এই গ্রামে বোলপুর-পালিতপুর

সড়কে পাঁচশুয়া হইয়া গ্রাম্য পথে এই স্থানে আসিতে হয়। পথে একটি ছোট নদী পড়ে। কথিত হয় এককালে অজয় নদী এই গ্রামের পাশ দিয়া প্রবাহিত হইত। এই নদীপথে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ফলে গ্রামটি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। বর্গীর হাঙ্গামার সময় বর্গীদের আক্রমণে গ্রামটির প্রভূত ক্ষতি হয়। বর্তমানে গ্রামটির চারিপার্শ্ব জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে।

গ্রামের প্রান্তদেশে একটি ভগ্ন জোড়বাংলা রীতির কালীমন্দির আছে। মন্দিরটির সম্মুখভাগ এবং ছাদের কিয়দংশ ভগ্ন। মন্দিরটি দক্ষিণদুয়ারী, বর্তমানে এ স্থানে কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত নাই, তবে বৎসরান্তে এই স্থানে মৃণ্ময়ী কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজান্তে বিসর্জন করা হয়। ভগ্ন মন্দিরটির প্রবেশপথের দিকে অবস্থিত স্তম্ভগাত্রে এবং পার্শ্বে কুচকাওয়াজ রত সৈন্যদল, শুম্ভ-নিশুম্ভদলনী চণ্ডী, কালভৈরব, শিব, মহিষাসুরমর্দিনী, কালী ইত্যাদির প্রতিকৃতি এবং শিকারের দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ। মৃৎফলকে ক্ষোদিত অন্যান্য বিষয়বস্তুর মধ্যে কৃষ্ণলীলার দৃশ্যাবলী এবং প্রবেশপথের উপরিভাগে ও পার্শ্বে পৌরাণিক ঘটনাবলী-সমূহও প্রতিফলিত। বহির্গাত্রে দলবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান ইউরোপীয় সৈনিক ও উর্দি পরিহিত দ্বারপালগণের ফলকের মধ্যে উপস্থিতি লক্ষণীয়। শিল্প-শৈলীর পর্যালোচনা পূর্বক ধারণা হয় এই মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত। বীরভূম জেলার অন্যত্র এ পর্যন্ত 'জোড়বাংলা' স্থাপত্যরীতির মন্দির নজরে আসে নাই। মন্দিরটি ভগ্ন হইলেও মন্দিরগাত্রে সন্নিবেশিত ফলকগুলির উপর রূপায়িত প্রতিকৃতি-সমূহ ও দৃশ্যাবলী আন্তরিকতার সহিত উৎকীর্ণ। সম্প্রতি মন্দিরটি রাজ্য সরকারের সংরক্ষণাধীনে আনীত, জীর্ণোদ্ধারের কার্য শীঘ্র আরম্ভ হইবে।

ইটাণ্ডা গ্রামের বাজারপাড়ায় বঙ্গাব্দ ১২৩৫ সালে (১৭৫০ শকাব্দে) প্রতিষ্ঠিত একটি দক্ষিণদুয়ারী 'পঞ্চরত্ন' মন্দির ও তাহার পার্শ্বে বঙ্গাব্দ ১২২২ সালে (১৭৩৭ শকাব্দে) প্রতিষ্ঠিত এক মন্দির আছে। পঞ্চরত্ন মন্দিরগাত্রে সিংহাসনে উপবিষ্ট রামসীতা এবং দশাবতারগণের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে।

ইলামবাজার : বোলপুর রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় ১২ মাইল পশ্চিমে অজয় নদীতীরে অবস্থিত ইলামবাজার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ইলাম-বাজার থানার সদর এইখানে অবস্থিত। এখান হইতে একটি সড়ক অজয় নদী পার হইয়া গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে কাঁকসার নিকট মিশিয়াছে, আর

একদিকে একটি সড়ক দুবরাজপুর-সিউড়ীর দিকে গিয়াছে। এখানে অবস্থানের জন্য পূর্ত (সড়ক) বিভাগের একটি পরিদর্শন বাংলো আছে।

গ্রামের হাটতলায় টিনের ছাউনী দ্বারা আচ্ছাদিত এক অষ্টকোণাকৃতি মন্দির আছে। মন্দির গাত্রে মৃৎফলকের উপর সুন্দর অলঙ্করণ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের সংরক্ষণের আওতায় মন্দিরটি আনীত এবং জীর্ণোদ্ধারের পরিকল্পনা গৃহীত হইতে চলিয়াছে। মন্দিরে কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত নাই, তবে বৎসরান্তে একবার গ্রামমধ্য হইতে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের বিগ্রহ আনিয়া মন্দির মধ্যস্থ বেদীতে রক্ষিত হইয়া পূজিত হয়। মন্দির গাত্রে লম্বালম্বিভাবে দশমহাবিদ্যা ও দশাবতারগণের প্রতিকৃতি সম্বলিত ফলকসমূহ সন্নিবেশিত আছে। ইউরোপীয় নরনারীগণের প্রতিকৃতিও মন্দির ভিত্তি গাত্রের নিকট ক্ষোদিত আছে। পত্রলতা দ্বারা শোভিত নকলদ্বার রূপায়ণ এই মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাসমণ্ডল, উষ্ট্রারোহী, ব্যাঘ্র, ময়ূর ইত্যাদির প্রতিকৃতির দ্বারা মন্দিরগাত্র সুশোভিত।

গ্রামের 'বামুনপাড়ায়' দক্ষিণমুখী লক্ষ্মী-জনার্দন মন্দির অবস্থিত। ১৭৬৮ শকাব্দে (বঙ্গাব্দ ১২৫৩ সালে বা ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে) এই পঞ্চরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের প্রবেশপথের খিলানের উপরিভাগের মধ্যস্থলে রাসমণ্ডল, গিরিগোবর্ধন ধারণ, গোষ্ঠলীলা, (দক্ষিণে) মহিষাসুরমর্দিনী, শিবদুর্গা এবং (বামে) রাম-রাবণের যুদ্ধ, সিংহাসনে উপবিষ্ট রাম-সীতা ইত্যাদির প্রতিকৃতি ও দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ। এই সমস্ত দৃশ্যাবলীর ঊর্ধ্বে মথুরায় গমনোদ্যত কৃষ্ণ-বলরাম এবং সংকীর্তনের দৃশ্যাবলী রূপায়িত। স্তম্ভগাত্রে কোন অলঙ্করণ নাই।

এই মন্দিরের অনতিদূরে একটি 'দেউল' আছে। প্রবেশপথের উপরিভাগে মধ্যস্থলে রাম-সীতার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। গোষ্ঠলীলা, অনন্তশায়ী বিষ্ণু ইত্যাদির প্রতিকৃতিও আছে। দুইপার্শ্বে 'গজব্যাল' মূর্তির অনুসরণে নির্মিত লম্বালম্বিভাবে হস্তীর উপর সিংহ তাহার উপরে অশ্বের প্রতিকৃতির পুনরুল্লেখ লক্ষণীয়। উত্তরদিকে বৃহৎ আকৃতির মহিষাসুরমর্দিনী ও দক্ষিণে যুগ্ম সিংহের উপর উপবিষ্টা জগদ্ধাত্রীর প্রতিমূর্তি দর্শনীয়। মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি-খচিত ফলকের উপরে নন্দী-ভৃঙ্গী সহ শিব ও কলসধৃতা নারীমূর্তি উৎকীর্ণ। নিকটেই অবস্থিত একটি দেউলে কোন অলঙ্করণ নাই।

উচকরণ: নান্নুর থানার অন্তর্গত এই গ্রাম নান্নুরের ঠিক দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। 'ধর্মমঙ্গল' রচয়িতা হৃদয়রাম সৌ এই সমৃদ্ধিশালী

গ্রামে 'চাঁদরায়' নামে প্রসিদ্ধ ধর্মঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। অজয় নদীর 'সিদিয়া দহ' হইতে এই দেবমূর্তির আবির্ভাব হয় জনশ্রুতি আছে। গ্রামমধ্যে অবস্থিত প্রসিদ্ধ চাঁদরায়ের মন্দিরটি ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সাম্প্রতিককালে মন্দিরটির সংস্কার সাধন হয়। পূর্বে এই মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর অলঙ্করণ ছিল জানা যায়। সমতল ছাদ-বিশিষ্ট দালান আকৃতির মন্দিরগাত্রে বর্তমানে কোন অলঙ্করণ নাই। মন্দিরের দ্বারপার্শ্বে কাষ্ঠনির্মিত চৌকাঠের উপর ক্ষোদিত অলঙ্করণগুলি রমণীয়। আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্প-শৈলী অনুসারে নির্মিত কাষ্ঠের উপর ক্ষোদিত দশাবতার ইত্যাদির মূর্তি ও লতাপাতার অলঙ্করণ অতীব সুন্দর এবং মৃৎফলকের অলঙ্করণের সহিত এইগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য ও ভাবব্যঞ্জনা আছে।

এই গ্রামের সরখেল পরিবারের গৃহের সম্মুখে চারিটি চার-চালা মন্দির আছে। বঙ্গাব্দ ১১৭৫ সালে অর্থাৎ ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমদুয়ারী এই মন্দির সংস্থানমধ্যে আরও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল ধারণা হয়। রামায়ণের কাহিনী যথা রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাজসভায় রামচন্দ্র, দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, গোপিনীসহ কৃষ্ণ, মহিষাসুরমর্দিনী, বৃষোপরি শিব-পার্বতী, জটায়ু বধ, সূর্পণখার নাসিকা ছেদন, ইত্যাদির ঘটনা মন্দির গাত্রে প্রতিফলিত। মধ্যের দুইটি মন্দিরের চালের সূক্ষ্ম কার্নিসের গাত্রে বক্রাকারে রামায়ণ ও কৃষ্ণলীলার কাহিনী রূপায়ণ এই মন্দিরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। সচরাচর এই ধরণের কারুকার্য নজরে পড়ে না। মন্দিরগুলির অলঙ্করণের মধ্যে এক সূক্ষ্ম সৌন্দর্য লুক্কায়িত। মন্দিরগুলি ক্রমশঃ জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, সংরক্ষণের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

কঙ্কালীতলা ঃ বোলপুর থানার অন্তর্গত এই পীঠস্থান বোলপুর হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পূর্বে বেঙ্গুটীয়া মৌজায় অবস্থিত। জনশ্রুতি আছে সতীর কঙ্কাল এই স্থানে পতিত হয়। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় রচিত 'অন্নদা মঙ্গল' কাব্যে পীঠমালা অধ্যায়ে (১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ) বর্ণিত আছে ঃ—

'কাঞ্চীদেশে পড়িল কাঁকালি অভিরাম।
বেদগর্ভা দেবতা ভৈরব রুরু নাম॥' ৪০

'পীঠনির্ণয়ে' উক্ত আছে ঃ—

'কাঞ্চীদেশে চ কঙ্কালো ভৈরবো রুরুনামকঃ।*
দেবতা দেবগর্ভাখ্যা'.........(পাঠান্তরে বেদগর্ভাখ্যা)

* পাঠান্তরে—(ক) 'কঙ্কালী ভৈরবো রুরুনামতঃ' ;
(খ) 'কাঞ্চিদেশে চ কঙ্কালি ভৈরবো রুরুনামতঃ'।

'শিবচরিতে'র মতে কাঞ্চী মহাপীঠরূপে পরিগণিত, এবং অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় অনুমান করেন যে সম্ভবতঃ কোপাই নদী তীরবর্তী বীরভূম জেলার কোন এক স্থানকে এই পীঠস্থানরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। দেবীর পতিত কঙ্কাল স্পর্শে পবিত্রপুণ্যভূমির উপর সাম্প্রতিককালে এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দির পার্শ্বে এক পবিত্র কুণ্ড। অদূরে এক উচ্চ ভূখণ্ডের উপর কাঞ্চীশ্বর শিব এবং দেবীর 'ভৈরবথান' অবস্থিত। *District Census Handbook* (*1961*), ***Birbhum*** গ্রন্থে বোলপুর থানার অন্তর্গত আমডহরা, জলজোল, ডানবারীপুর এবং বেঙ্গুটীয়া প্রভৃতি গ্রামে 'সতীর কঙ্কাল' পতিত হইয়া পীঠস্থানে পরিণত হইবার কাহিনীর উল্লেখ আছে (পৃঃ ১০১, ১০৯, ১২৩ এবং ৩৯০ দ্রষ্টব্য)। অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে বেঙ্গুটীয়া গ্রামেই আসল কঙ্কালী দেবীর পীঠস্থান অবস্থিত।

কচুজোড় : সিউড়ী থানার অন্তর্গত এবং সিউড়ী হইতে প্রায় ৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সিউড়ী-দুবরাজপুর সড়কের ধারে অবস্থিত এই গ্রাম রাজা রুদ্রচরণের রাজধানীরূপে গণ্য। জনশ্রুতি আছে যে প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে এই রাজা রাজত্ব করিতেন এবং বাহুবলে আপন রাজ্য বিস্তার করিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এই গ্রাম-সংলগ্ন উত্তর দিকের প্রান্তরে রাজার সহিত মারাঠা বর্গীদের যুদ্ধ হয় এবং রাজা নিহত হন, স্থানীয় জনপ্রবাদ। পরে এই স্থান 'সংগ্রামপুব' নামে খ্যাত হয়। এখানের ভগ্ন মন্দিরে ভগ্ন কালীমূর্তি ছিল, সম্প্রতি তাহা অপহৃত হইয়াছে। গ্রামের সাহানা পরিবারের গৃহে অষ্টধাতুর এক রাজ-রাজেশ্বরী মূর্তি পূজিতা হইতেছেন। মারাঠা বর্গীর আক্রমণে গ্রামটির যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং ঐ সময় গ্রামটি প্রায় পরিত্যক্ত হয়।

কনকপুর : মুরারই থানার অন্তর্গত এই গ্রাম মুরারই রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই স্থানের অপরাজিতা দেবীর অধিষ্ঠানের কথা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রস্তরনির্মিত দেবীমূর্তির বর্তমানে মুখমণ্ডলটি শুধু দৃষ্ট হয়। জনশ্রুতি আছে দেবীর দেহের অন্য অংশ অনুচ্চ বেদীমধ্যে প্রোথিত আছে। দেবীর পূর্ব অধিষ্ঠানভূমি ও মন্দিরাদি বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য পরিত্যক্ত। দেবীর মূর্তি বর্তমানে একটি দালান আকৃতি মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের সম্মুখে একটি ইষ্টকনির্মিত চার-চালা মন্দির

আছে। গ্রামের প্রবেশ পথে ১২৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঘোষাল বংশের এক চার-চালা মন্দির বর্তমান। মন্দির গাত্রে ‘পঙ্কের’ প্রলেপ দেখা যায়। মন্দিরগাত্রের অন্যান্য অলঙ্করণের মধ্যে ‘নকল দরজার’ এবং জ্যামিতিক রেখাচিত্রের সমকালীন অনুকৃতি বর্তমান।

এই গ্রাম ভাণ্ডীরবনের ভাণ্ডীশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠাতা ধর্মাত্মা রামনাথ ভাদুড়ী মহাশয়ের নিবাসস্থলরূপে প্রসিদ্ধ। তাঁহার বাসভূমির ধ্বংসাবশেষের সমস্ত চিহ্ন বর্তমানে অবলুপ্ত। অপরাজিতাদেবীর মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত চার-চালা শিবমন্দিরটি রামনাথ ভাদুড়ী মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় স্থানীয় জনপ্রবাদ। কথিত হয় গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ‘লাডুবী’ পুষ্করিণীতে বর্গীর অত্যাচার হইতে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য ভাদুড়ী মহাশয় সপরিবারে নৌকারোহণ পূর্বক জল নিমজ্জনে সকলে আত্মহত্যা করেন। কনকপুর গ্রামের উত্তরে অবস্থিত মলয়পুর এক প্রাচীন গ্রাম। কনকপুর গ্রামের পশ্চিমে বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা জেলার সীমানা আরম্ভ।

কবিলাসপুর: সিউড়ী হইতে রাজনগর যাইবার পথে লাউজোড় গ্রাম হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে এই গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটি রাজনগর থানার অন্তর্গত এবং পাকা রাস্তা হইতে গ্রাম্যপথে প্রায় ২ মাইল গমন করিলে মন্দিরে পৌঁছান যায়। এখানের প্রস্তরনির্মিত রেখ-দেউলটি স্থানীয় জনসাধারণের নিকট ‘ধর্মরাজের মন্দির’ রূপে পরিচিত এবং বর্তমানে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার সংরক্ষণাধীনে আছে। মন্দিরটির গঠনপ্রণালী একটু বিচিত্র ধরণের—মন্দিরের ‘পাভাগ’ অর্থাৎ ভিত্তিবেদী হইতে শিখরটি কৌণিকভাবে উদ্গত হইয়া ‘মস্তকে’ উপনীত, মধ্যের ‘বাড়’ ও ‘গণ্ডীর’ মধ্যে কোন ব্যবধান দেখা যায় না। মন্দিরটি প্রায় ৪৫ ফিট উচ্চ। খয়রাশোল থানার অন্তর্গত পাঁচড়া গ্রামে এই ধরণের ‘শিখর’ রীতির এক মন্দির আছে, তবে ঐ স্থানে মন্দিরের সম্মুখে ‘এক-বাংলা’ (দো-চালা) রীতি অনুযায়ী নির্মিত মণ্ডপ দেখা যায়। কবিলাস-পুরের মন্দিরে বর্তমানে কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত নাই। মন্দিরগাত্রে প্রবেশ-পথের উপর পৃথক পৃথক প্রস্তরফলকে লিপিমালা উৎকীর্ণ আছে। একটি বৃহৎ অপরটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। প্রথমটিতে আট লাইনের লিপি এবং দ্বিতীয়টিতে ছয় লাইনের লিপি ক্ষোদিত আছে। সম্প্রতি *‘Indian Museum Bulletin’* পত্রিকার *January-July pp 7-9* সংখ্যায় ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় এই লিপি দুইটির পাঠোদ্ধার পূর্বক *‘Inscriptions From the Kabilaspur Temple,*

Saka 1565' শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রথমে ৬ লাইন বিশিষ্ট লিপিটির পাঠোদ্ধার নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ—

"[স্বস্তি চিহ্ন] শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ ॥
গিরীশ মুখ ষন্মুখা-(১) ননশরেন্দু সংখ্যান্বিতে
শকাব্দ নিকরেহ (২) রের খিল কামদং মন্দিরম্।
অপূর্ব দৃশ-(৩) দাচিতং রচিত্বানিদং শ্রদ্ধয়া তদীয় (৪)
পদ বাঞ্ছয়া করণ রূপদাসঃ কৃতী ॥ (৫)
১৫৬৫ ॥" (৬)

এই লিপি পাঠে জানা যায় যে রূপদাস নামে জনৈক কায়স্থ (করণ) সুন্দর প্রস্তরনির্মিত এই হরি (বিষ্ণু) মন্দির নির্মাণ করেন। ভগবৎপ্রীতির স্মারকরূপে গণ্য এই মন্দির সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবে এবং ভগবৎ পদলাভের অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ হইবে ইহা কামনা করিয়া মন্দির নির্মিত হয়।

দ্বিতীয় লিপিটির পাঠোদ্ধার এইরূপ করা হইয়াছে ঃ—

"শুভমস্তু শকাব্দঃ ১৫৬৫ ॥ পূর্বয়া যস্য নিবাসভূর্মির
তুলাসামাসনা বিশ্রুতা যস্য খ্যাতিরতীর দান জনিতা
যস্যা=ভি (তি) ভূপা (২)
দরঃ। যস্য দ্বারিচ দান-মান-মহিতাঃ সন্তঃ শুভাশংসিনঃ
কীর্তিঃ (৩)
শ্রীযুত রূপদাস সুধিয় স্তস্যাস্ত কল্পাবধি ॥
এনাং কীর্তিমপা (৪)
করোতি যদি কোপ্যঙ্গ (জ্ঞা) নতা লো (সং) বৃতোবর্ণ্ণস্ত
স্ত্বয়া নিবারণায় শপ (৫)
নং গোভ [স] ক (ক্ষ) ণং বর্ততাম (তাম)।—
ধর্মাত্মা যবনো ভবেদানু যুগং ভূপৌ (৬)
পি সম্ভাব্যতে তত্রায়ং বিনা পাপহাংশ্চ শপনঞ্চা
অষ্টাং বরাহাশনম্ ॥ (৭)
মেহতরি শ্রীহরিদাস ॥" (৮)

আঁলোচ্য লিপিটিতে রূপদাসের পরিচিতির উল্লেখ আছে। বিখ্যাত সামাসনা হইতে আগত এই রূপদাস তাঁর দান-ধ্যানের দ্বারা যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন এবং দেশের শাসনকর্তার নিকট সমাদৃত হন। আরও জানা যায় যে তাঁর দ্বারে যে সমস্ত পুণ্যার্থীগণ সমবেত হইতেন এবং তাঁহার শুভকামনা করিতেন তাঁহাদিগকে তিনি উপঢৌকন প্রদান করিতেন।

পরবর্তী শ্লোকে উল্লেখ আছে যে কোন অবর্ণব্যক্তি এই মন্দিরের ক্ষতি সাধন করিলে গোমাংস ভোজনের পাপে বিনষ্ট হইবে। আরও বর্ণিত আছে যে জনৈক ধার্মিক যবন (মুসলমান) যিনি এই অঞ্চলে যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হন তিনি ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের শাসনকর্তারূপে পরিগণিত হইবেন। অভিশাপের আরও উল্লেখ আছে যে এই মন্দির ধ্বংসকারী শূকরমাংস আহারজনিত পাপে দুষ্ট হইবে। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উপরোক্ত সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়। মন্দির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত রাজনগরের মুসলমান ফৌজদারগণের কোন এক বিশেষ জনকে এই শিলালিপিতে সম্ভবতঃ ধার্মিক যবন শাসনকর্তারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। বাহাদুর খান বা রণমস্ত খান ১৬০০-১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন জানা যায়। তাঁহার রাজত্বকালে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়, দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও কৃষিকার্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ এই শাসনকর্তার প্রতি ইঙ্গিত লিপিমধ্যে আছে।

হিন্দু মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবীর পূজা অর্চনার জন্য রাজনগরের মুসলমান ফৌজদারগণের পৃষ্ঠপোষকতা, অর্থ সাহায্য এবং ভূদানের দৃষ্টান্ত সমকালীন লিপি বা নথি-পত্র হইতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত বক্রেশ্বর মন্দির নির্মাণে এবং পূজা অর্চনার জন্য ভূদান রাজনগর ফৌজদার-গণের পৃষ্ঠপোষকতার অন্যতম দৃষ্টান্ত রূপে সুবিদিত।

রূপদাসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তীকালে 'হেতমপুরের দুর্গ' 'বাঁকা দিলীপ চাঁদ সরকার' নামে জনৈক ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে রহিবার তথ্যাদি পাওয়া যায়। আরও অবগত হওয়া যায় যে তাঁহার প্রকৃত নাম রূপচাঁদ দাস, রাজনগরের অন্তর্গত রাধানগরে তাঁহার বাস ছিল। তিনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য নির্বাহ করিবার জন্য তিনি রাজ সরকার হইতে 'বাঁকা দিলীপ চাঁদ' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই ব্যক্তি রাজনগর রাজের নিকট হেতমপুরের নিকটবর্তী কোন স্থানে কিছু নিষ্কর জমি প্রার্থনা করিয়া তাহা লাভ করেন। বঙ্গাব্দ ১১৬৪ সালের ২৫শে ফাল্গুন তারিখে প্রদত্ত এই জমিদানের সনদের কিয়দংশ 'বীরভূম বিবরণ' ২য় খণ্ডের ৩২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উল্লিখিত আছে।

'মেহতরি হরিদাস' সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই। ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় অনুমান করেন সম্ভবতঃ মন্দির নির্মাণে রক্ষণাবেক্ষণ-কারীরূপে উপরোক্ত হরিদাস নিযুক্ত ছিলেন। ফার্সী 'মিহ্‌তর' শব্দ

হইতে এই 'মেহতরি' শব্দের উৎপত্তি এবং ভারতবর্ষে সাধারণতঃ আবর্জনা অপসারণ কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ 'মেথর' অর্থে এই শব্দ প্রচলিত আছে একথার উল্লেখ অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের প্রবন্ধে আছে। এই শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ মন্দির নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারেন না এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ডঃ সরকার মহাশয় 'মেহতরৈ' শব্দ মহারাষ্ট্রীয় শব্দ হইতে উদ্ভূত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় 'মেহতরৈ' শব্দ সাধারণতঃ গ্রামের মোড়ল বা 'পাটিল' অথবা গ্রামের হিসাবরক্ষক বা 'কুলকরণী'কে বোঝায় এবং এই কারণে ডঃ সরকার মহাশয়ের ধারণা যে 'মেহতরি হরিদাস' সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্রদেশাগত এবং বীরভূমে আসিবার পর তিনি উল্লিখিত রূপদাসের আধিকারিকরূপে নিযুক্ত ছিলেন।

বীরভূমের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনার পর ডঃ সরকার মহাশয়ের উপরোক্ত মন্তব্য সমর্থন করা যায় না। লেখকের ধারণা শ্রীহরিদাস তথাকথিত মেথর শ্রেণীভুক্ত এবং তিনি মন্দির নির্মাণ কার্যে সম্ভবতঃ স্থপতিরূপে রূপদাস কর্তৃক নিযুক্ত হন। বর্তমান বীরভূমের বিভিন্ন অঞ্চলে 'হাড়ি' জাতির এক শাখারূপে পরিগণিত এই 'মেথর-হাড়ি' শ্রেণীর জনসমাজের অবস্থিতি সম্বন্ধে তথ্য গত লোক-গণনার রিপোর্ট হইতে পাওয়া যায়। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে এই শ্রেণীর জনগণের মন্দির নির্মাণকার্যে নিযুক্ত হইবার লিপিগত প্রমাণ ১২৯৬ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত বীরভূমের দুবরাজপুর শহরে 'বাজারপাড়া'য় অবস্থিত এক 'ত্রয়োদশরত্ন' মন্দিরগাত্রে বাঙ্গালা অক্ষরে এবং বাঙ্গালা ভাষায় উৎকীর্ণ লিপির মাধ্যমে পাওয়া যায়। এই মন্দিরগাত্রে এই শব্দগুলি উৎকীর্ণ আছে—'খোদিত কারিকর শ্রীগোপিনাথ হাড়ি সাং দুবরাজপুর ঘর'। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে তথাকথিত হাড়ি জাতির ব্যক্তিদের দ্বারা মন্দির নির্মাণকার্যে সহায়তার দৃষ্টান্ত স্বভাবতই সপ্তদশ শতাব্দীতে কবিলাসপুরের মন্দির নির্মাণকার্যে মেহতরি শ্রীহরিদাসের স্থপতিরূপে নিযুক্ত হওয়ার অনুমানকে সমর্থন-পূর্বক বীরভূমে মেথর-হাড়ি শ্রেণীভুক্ত জনগণের শিল্পৈষণার পরিচয় দেয়। (কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'আসর পত্রিকার' একুশ বর্ষ, নববর্ষ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭৭ সংখ্যায় লেখক কর্তৃক রচিত 'বীরভূমের' মন্দির স্থপতি প্রসঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধ; পৃ ৪৫-৪৮ দ্রষ্টব্য।)

বীরভূমে চৈতন্য-পরবর্তী যুগে 'হরি' বা বিষ্ণু মন্দির প্রতিষ্ঠা বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে বিশেষ চিত্তাকর্ষক। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের

প্রভাবে এই সময় বীরভূমের বহুস্থানে রাধা-কৃষ্ণের লীলামূর্তি বিশেষ-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ভাগবত ধর্মের প্রভাবে বিষ্ণু-বাসুদেব মূর্তি পূজা এই সময় প্রায় লোপ পায়। পরবর্তীকালে ধর্ম ও শিবপূজা বীরভূম অঞ্চলে প্রসার লাভ করিলে এই মন্দির ধর্মরাজ বা শিবের মন্দিররূপে জনসাধারণের কাছে পরিচিতি লাভ করে।

করিধ্যা ঃ সিউড়ী থানার অন্তর্গত এবং সিউড়ী সহরের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত এই গ্রাম তাঁত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। বিভিন্ন স্থাপত্য শৈলীর অনুসরণে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত অনেকগুলি মন্দির এই গ্রামে আছে। মন্দির গাত্রে কোন অলঙ্করণ নাই।

কলহপুর ঃ মুরারই থানার অন্তর্গত এবং মুরারই রেলষ্টেশন হইতে কিছুদূর উত্তর পূর্বে বাঁশলই নদীতীরে অবস্থিত। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে জমিদার কিষণদাস রায়চৌধুরী প্রভৃতির দ্বারা এই গ্রামের পত্তন হয়। প্রাচীন সনদ ও দলিল দস্তাবেজে এই গ্রামের 'কলপুর' নামে উল্লেখ আছে। কলহপুরে রাজসাহীর জমিদার লালা উদয়নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺মদনমোহন বিগ্রহের মন্দির আছে।

কলেশ্বর ঃ ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত এই গ্রামে সাঁইথিয়া জংসন রেলষ্টেশন হইতে উত্তর-পূর্বে বীরভূম-কান্দী সড়ক ধরিয়া আসিতে হয় এবং গ্রামটি প্রায় মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্তের নিকটবর্তী। ঢেকার রাজা রামজীবনের প্রতিষ্ঠিত সুউচ্চ কলেশনাথ শিবের মন্দির এই গ্রামের দর্শনীয় পুরাকীর্তি। মন্দিরটি 'নবরত্ন' রীতি অনুযায়ী নির্মিত হয় এই কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালে সংস্কার সাধনের ফলে মন্দিরের গঠন পরিবর্তিত হইয়া 'রত্ন মন্দিরের' আকৃতি ধারণ করিয়াছে। 'বীরভূম বিবরণ' ২য় খণ্ডে ২০৮ পৃষ্ঠার পর প্রদত্ত মন্দিরের পুরাতন আলোকচিত্র দেখিয়া ধারণা হয় মন্দিরটি সুউচ্চ আট-চালা রীতি অনুসরণ করিয়া নির্মিত হয়। কালক্রমে মন্দিরসম্মুখে দালান ও দালানের উপরিভাগে চার-চালা মন্দিরের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি সন্নিবেশিত হয়। অস্পষ্ট আলোকচিত্র হইতে মন্দির গাত্রে মৃৎফলকের উপর অলঙ্করণ (?) ছিল মনে হয়, সংস্কার সাধনের ফলে পলস্তরা দ্বারা সমস্ত দেওয়াল এখন আবৃত। মন্দির চত্বর সংলগ্ন এক প্রকোষ্ঠে কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি রক্ষিত আছে। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকের শিল্প-শৈলী অনুসারে নির্মিত কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তি এইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

কীর্ণাহার ঃ নান্নুর থানার অন্তর্গত এবং নান্নুরের প্রায় ৩ মাইল উত্তরে অবস্থিত এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে কিঙ্কিন নামে এক রাজা ছিলেন কথিত হয়। কিলগির খাঁ নামে এক পাঠান এই রাজাকে হত্যা করিয়া কীর্ণাহার দখল করেন জনশ্রুতি আছে। এই দুইজনের নামের এবং কীর্তিকলাপের সহিত জড়িত অনেক কিংবদন্তী এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। গ্রামের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ইঁহাদের আবাসস্থান ইত্যাদি চিহ্নিত হয়। কথিত আছে যে বর্ধমানের 'অমরার গড়' অঞ্চল হইতে আসিয়া কিঙ্কিনরাজা নান্নুরের সাতরায়ের নিকট হইতে এই অঞ্চল গ্রহণ করেন।

উপরোক্ত কিংবদন্তী যাহাই হউক না কেন সাম্প্রতিককালে পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার ফলে কীর্ণাহার গ্রামের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। কীর্ণাহার হইতে শেষ প্রস্তরযুগে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র প্রস্তরায়ুধ এবং আদি-ঐতিহাসিককালে প্রচলিত কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্রের ভগ্ন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়া স্থানটির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কীর্ণাহারের পার্শ্ববর্তী গ্রাম নাগডিহিতে চণ্ডীদাসের সমাধি আছে বলিয়া জনশ্রুতি আছে, আবার কীর্ণাহার গ্রামের মধ্যে অবস্থিত এক উচ্চ ঢিবির উপর চণ্ডীদাসের সমাধিরূপে চিহ্নিত হয়।

কুষ্ঠিগিরি (খুশতিগিরী) ঃ ইলামবাজার থানার অন্তর্গত এই গ্রাম বোলপুর ষ্টেশন হইতে ১৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। সৈয়দ শাহ আবদুল্লা কীরমানী নামে এক মুসলমান সন্তের দরগা এই গ্রামে আছে। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে পারস্য দেশের কীরমান্ নামক স্থান হইতে মুসলমান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি এই অঞ্চলে আগমন করেন কথিত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। সিউড়ী হইতে প্রকাশিত 'শান্তিদূত' পত্রিকার ১ম-৪র্থ সংখ্যায় এ. মান্নাফ্ রচিত 'হজরত আবদুল্লাহ কেরমানী' শীর্ষক প্রবন্ধে এই সমস্ত অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। এখানের দরগার মধ্যে কালীমাতার সহ-অবস্থান সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়।

কোটাসুর ঃ ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত এই গ্রাম সাঁইথিয়া জংসন রেলষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এবং সহজেই বাসযোগে এখানে আসা যায়। জনশ্রুতি অনুসারে মহাভারতের বর্ণিত 'একচক্রা' নগরীর সহিত কোটাসুর যুক্ত হইয়া আছে। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস-

কালীন আবাসস্থল রূপেও এই স্থান প্রসিদ্ধ। গ্রামমধ্যস্থ উচ্চ ঢিবির উপর প্রতিষ্ঠিত মদনেশ্বর শিবমন্দির প্রাঙ্গণে রক্ষিত একটি বিরাট প্রদীপ আকৃতি প্রস্তরখণ্ড 'কুন্তীর প্রদীপ' নামে অভিহিত। আরও প্রবাদ প্রচলিত আছে যে পুরাকালে দুর্মদ সেন নামক জনৈক ক্ষত্রিয় নরপতি 'একচক্রায়' রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানীর নাম ছিল দুর্জয়কোট। এই রাজা মদনেশ্বর শিবের নিকট প্রার্থনা করিয়া এক পুত্রলাভ করিলে তাঁহার নাম রাখেন মদনদাস। দুর্মদ সেনের পরলোকগমনের পর মদনদাসের রাজত্বকালে রাজ্যে দারুণ বিপ্লব উপস্থিত হয়। 'বক' নামে এক দুর্ধর্ষ রাক্ষস 'একচক্রায়' আসিয়া মদনদাসকে সপরিবারে বিনষ্ট করিয়া 'একচক্রায়' আধিপত্য বিস্তার করে। কিংবদন্তী অনুসারে রাক্ষস ও অসুর এক পর্যায়ভুক্ত হইয়া যাওয়ার জন্য তদবধি দুর্জয়কোটের নাম হইয়াছে 'অসুরকোট'। কোটাসুর গ্রাম ও এই গ্রামমধ্যে প্রতিষ্ঠিত 'মদনেশ্বর শিবলিঙ্গ' সম্ভবতঃ উক্ত কাহিনীর স্মৃতিবহ। কোটাসুর হইতে প্রায় ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত অসুরালয় গ্রামের (অসুর্লা) মধ্যে 'অসুর ডাঙ্গা' নামে উচ্চভূমি রাক্ষসের বাসস্থানরূপে চিহ্নিত হইয়া থাকে।

গ্রামমধ্যে উঁচু ঢিবির উপর অবস্থিত মদনেশ্বর শিবমন্দির সাধারণ চার-চালা মন্দির। সাম্প্রতিককালে মন্দিরটি সংস্কার করা হয়। মন্দির সংলগ্ন চত্বরে আরও তিনটি সাধারণ শিবমন্দির আছে। মন্দির সম্মুখে নাটমণ্ডপ অবস্থিত। মন্দির প্রাঙ্গণে দুইটি প্রস্তরমূর্তি (একটি সূর্য ও অপরটি বিষ্ণুর) রক্ষিত আছে। মূর্তিদ্বয় আনুমানিক খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শিল্প-শৈলী অনুসারে নির্মিত। মন্দিরের নিকট 'দেবকুণ্ড' নামে একটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে ২০।২৫টি শিলামূর্তি আবিষ্কৃত হইবার সংবাদ পাওয়া যায়। মূর্তিগুলির অবস্থান সম্বন্ধে বর্তমানে কিছু জানা যায় না।

প্রাথমিক সমীক্ষাকালে গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া মৃৎপাত্র ও ইটের ভগ্নাবশেষ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। স্থানটির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের প্রতি রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। *Indian Archaeology 1964-'65 A Review* গ্রন্থে উল্লেখ আছে (পৃঃ ৭৯ দ্রষ্টব্য) যে আশুতোষ মিউজিয়ামের শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়চৌধুরী কর্তৃক পোড়ামাটির পুরাবস্তু, 'অ্যাগেট' এবং 'কারনেলীয়ান্' প্রস্তরের পুঁতি এবং মধ্যযুগে নির্মিত প্রস্তরমূর্তির অংশ

কোটাসুর হইতে সংগৃহীত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা শ্রীমতী জে. বার্মিংহাম ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার (পূর্বচক্র) সমীক্ষা-সহায়ক শ্রীভাস্কর সেনের সহযোগিতায় কোটাসুরের প্রত্নস্থল সমীক্ষা পূর্বক এই স্থান হইতে কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ ও ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভে ব্যবহৃত মৃৎপাত্রাদির নিদর্শন আবিষ্কার করেন। (*Indian Archaeology 1965-'66 A Review, Sec I 106-107* পৃষ্ঠা *Cyclostyled copy* দ্রষ্টব্য।)

খরবোনা: রামপুরহাট থানার অন্তর্গত এই গ্রাম রামপুরহাটের প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামের মধ্যে শৈলেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। চার-চালা রীতির মন্দির, মন্দির সম্মুখে মৃৎফলকের উপর অলঙ্করণ আছে।

খরবোনার প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে 'মৌবুনি ডাঙ্গায়' 'রাজবাড়ীর' নিদর্শন আছে শুনা যায়। বর্গীর হাঙ্গামার সময় বর্গীরা এখানে আসিয়া মধ্যে মধ্যে বাস করিত কথিত হয়। নিকটবর্তী ভাটিনা গ্রামেও রাজবাড়ীর অস্তিত্বের কাহিনী শুনা যায়। খরবোনার উত্তরে 'বুমকো-তলায়' ডাঙ্গার উপর 'বুমকেশ্বরী দেবী'র নামে পৌষ সংক্রান্তির সময় মেলা হয়। অদূরে কুসুম্বা গ্রামে বৃক্ষতলে ভগ্নমূর্তিসমূহের অবস্থিতি সম্বন্ধে জানা যায়। নিকটবর্তী বলরামপুর গ্রামেও কতকগুলি বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি আছে শুনা যায়। খরবোনার নিকট বড়জোল গ্রামের একটি ধ্বংসস্তূপ 'রাজবাড়ী' নামে চিহ্নিত। বড়জোলে বসুমতী দেবী আছেন। এই সমস্ত অঞ্চলে ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। খরবোনার পুরাকীর্তিসমূহ রাণী ভবানীর কর্মতৎপরতার সহিত জড়িত জনশ্রুতি আছে।

গণপুর: মহম্মদবাজার থানার অন্তর্গত এই গ্রাম সিউড়ী-মল্লারপুর সড়কের উপর অবস্থিত। মল্লারপুরের নিকটবর্তী গণপুর পূর্বে একটি বর্ধিষ্ণু ও সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। গণপুর এককালে দেশীয় প্রক্রিয়ায় লৌহ নিষ্কাশনের কেন্দ্র ছিল এবং এখানের চৌধুরী বংশীয়েরা লৌহ-ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রভাব এই গণপুরের উপর আসিয়া পড়ে।

গণপুর গ্রামের এই প্রাচুর্য সেখানে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য মন্দির সংস্থানের মধ্যে প্রতিফলিত। অধিকাংশ মন্দির গাত্রে এবং একটি দোলমঞ্চে ফুল-পাথরের ফলকের উপর সুন্দর অলঙ্করণ উৎকীর্ণ আছে। এক গ্রামে এতগুলি সুন্দর অলঙ্করণ বিশিষ্ট মন্দিরের অবস্থিতি বীরভূম জেলার

অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না এবং এই কারণে এইগুলি অবিলম্বে সংরক্ষণের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

গ্রামমধ্যে কালীতলায় ১৪টি চার-চালা রীতির শিব মন্দির এবং একটি দোলমঞ্চসহ এক মন্দির সংস্থান সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। মন্দির-গুলির অবস্থিতি এই প্রকার—পূর্বদিকে ৭টি মন্দির, পশ্চিমে ৪টি, উত্তরে ৩টি মন্দির এবং একটি দোলমঞ্চ। উপরোক্ত মন্দিরগুলির মধ্যে ৪টি মন্দির গাত্রে মন্দির প্রতিষ্ঠার 'সন-তারিখ' উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরগুলি ১৭৬৭ হইতে ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চৌধুরী পরিবার দ্বারা নির্মিত হয় জানা যায়। কথিত হয় এ সময় বীরভূমে দারুণ দুর্ভিক্ষ হয় এবং তৎকালে দরিদ্র গ্রামবাসীদিগকে মন্দির নির্মাণ কার্যে সহায়তার বিনিময়ে তাহাদের আহার্যের সংস্থানের ব্যবস্থা প্রশংসনীয়।

মন্দিরের সম্মুখে খিলানের উপর এবং দ্বারপার্শ্বে ফুলপাথরের ফলকগুলি সজ্জিত আছে। প্রধান ঘটনাবলীর মধ্যে রাম-রাবণের যুদ্ধ, দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন, কার্তিক-গণেশ, রাসমণ্ডল, কৃষ্ণ এবং লম্বালম্বিভাবে সজ্জিত ফলকগুলির মধ্যে দশাবতার, কৃষ্ণলীলা, অন্যান্য দেব-দেবী, যোদ্ধা ইত্যাদির প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরের ভিত্তির নিকট ফলকগুলিতে শোভাযাত্রা ও যুদ্ধের দৃশ্যাবলী ক্ষোদিত।

ঐ স্থানে শ্রীকীর্তিভূষণ মণ্ডলের গৃহ সংলগ্ন মৃণ্ময় প্রাচীর গাত্রে একই ধরণের ২টি ক্ষুদ্র মন্দিরের (নিবেদন মন্দির ?) প্রতিকৃতির অবস্থিতি লক্ষণীয়।

উপরোক্ত মন্দির সংস্থান হইতে কিছুদূরে শ্রীমহাদেব ভট্টাচার্যের গৃহের সম্মুখে ৫টি চার-চালা রীতির মন্দিরের অবস্থিতিও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। মন্দিরগুলি কোন্ সময় নির্মিত হইয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই। ফুলপাথরের ফলকে সজ্জিত এখানের খিলানের উপর উৎকীর্ণ দৃশ্যাবলীর শিল্প-শৈলী সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দৃশ্যগুলির মধ্যে কৃষ্ণের জন্ম, দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এবং কৃষ্ণ কর্তৃক দ্রৌপদীকে রক্ষা, সমুদ্র মন্থনের ঘটনাবলী ও দেবাসুরের মধ্যে মোহিনী কর্তৃক অমৃত বিতরণ এবং পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে বর্ণিত অন্যান্য ঘটনাবলী এখানের ফলকগুলির অলঙ্করণের মধ্যে প্রতিভাত। ফুল-লতা-পাতা এবং অন্যান্য পশু-পক্ষীর প্রতিকৃতি এই সমস্ত মন্দিরগুলির সজ্জায় ব্যবহৃত হইয়াছে। গ্রামের দৈনন্দিন ঘটনাবলীও মন্দির গাত্রে প্রতিভাত।

গ্রামের দক্ষিণ দিকে এক স্থানে একত্রে ১৮টি চার-চালা এবং আট-

চালা রীতির শিবমন্দির সংস্থানের অবস্থিতি দেখা যায়। মন্দিরগাত্রে কোন অলঙ্করণ নাই। একটি মন্দিরগাত্রে '১৭১৬ শকাব্দ'; সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠার সময় উৎকীর্ণ আছে।

গ্রামের উত্তর দিকে শ্রীজয়কৃষ্ণ মণ্ডলের গৃহ সংলগ্ন জীর্ণ এবং পরিত্যক্ত এক আট-চালা বিষ্ণু মন্দির দর্শনীয়। পীরিতরাম মণ্ডল কর্তৃক ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ ১১৭৬ সালে) মন্দিরটি নির্মিত হয় জানা যায়। আয়তনে অন্য মন্দিরগুলির অপেক্ষা বৃহৎ এই মন্দিরগাত্রে ফুলপাথরের ফলকে রাম-রাবণের যুদ্ধ, মহিষাসুরমর্দিনী, গোপিনীসহ কৃষ্ণের প্রতিকৃতি প্রবেশপথের খিলানের উপর উৎকীর্ণ। এই মন্দিরের নিকট ছয়টি সাধারণ চার-চালারীতির মন্দির আছে।

গণুটিয়াঃ লাভপুর থানার অন্তর্গত সাঁইথিয়া রেলষ্টেশন হইতে প্রায় ১১ মাইল পূর্বে ময়ূরাক্ষী নদীতীরে অবস্থিত এই গ্রাম। এই গ্রামে ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তরতীরে 'বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানীর' রেশম কুঠিগুলি অবস্থিত ছিল এবং এককালে এখানের রেশম শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ ফ্রুসার্ড নামে এক *Agent*কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই স্থানে নিযুক্ত করেন। ফ্রুসার্ডের মৃত্যুর পর মিঃ জন চীপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর *Commercial Resident* বা 'ব্যবসায়িক প্রতিনিধি' রূপে গণুঁটিয়ার কুঠির দায়িত্ব এবং পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। চীপ সাহেব এই স্থানে দেহত্যাগ করেন এবং এখানেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। বীরভূম জেলার শাসন কেন্দ্র সিউড়ীতে ইংরাজ সাহেবদের জন্য নির্দিষ্ট সমাধিক্ষেত্রে (বড়বাগানের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত) জন চীপের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ স্মৃতিফলকসহ এক ক্ষুদ্র স্তম্ভ প্রোথিত আছে। ফ্রুসার্ডের প্রতিষ্ঠিত কুঠি কয়েকবার সংস্কার করা হয়। বর্তমানে ঐগুলির ধ্বংসাবস্থা পরিলক্ষিত হয়। (গৌরীহর মিত্র প্রণীত "বীরভূমের ইতিহাস—" দ্বিতীয় খণ্ডের ১০-১৯ পৃষ্ঠায় গণুটিয়ার রেশম কুঠি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণী ও কুঠির আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।)

গোপালপুরঃ খয়রাশোল থানার অন্তর্গত, পাঁচড়া রেলষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত দুবরাজপুর-খয়রাশোল পাকা রাস্তার ধারে গোপালপুর মোড় হইতে প্রায় আধমাইল দূরে এই গ্রাম অবস্থিত।

এই গ্রামে অনেকগুলি মন্দির আছে, অধিকাংশই গ্রামস্থ বৈদ্য বংশের জমিদারগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরে শালগ্রাম শিলার পূজা অর্চনা হয় এবং এই কারণে ঐগুলি বিষ্ণু-মন্দির নামে অভিহিত।

এই গ্রামের দুইটি মন্দিরের গঠন প্রণালী একটু বিশেষ ধরণের। সমতল ছাদ বিশিষ্ট দ্বিতল অধিষ্ঠানের উপর একবাংলা রীতির ক্ষুদ্র দীপাগার সন্নিবেশিত। পার্শ্ববর্তী পেরুয়া গ্রামের 'রাধাবিনোদ মন্দির' এই ধরণের স্থাপত্য রীতি অবলম্বনে নির্মিত।

এতদ্ব্যতীত গ্রামমধ্যে ৫টি 'পঞ্চরত্ন' মন্দির আছে। কয়েকটি মন্দির-গাত্রে প্রতিষ্ঠাফলক উৎকীর্ণ আছে। একটি 'একরত্ন' বিশিষ্ট মন্দিরও গ্রামমধ্যে আছে। গ্রামের রাধাদামোদর জীউর মন্দিরটি ১২৯৫ বঙ্গাব্দে (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরগাত্রে অলঙ্করণ সামান্যই আছে।

গোহালীআড়াঃ দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত এই গ্রাম দুবরাজপুরের কয়েক মাইল উত্তরে অবস্থিত। কয়েকটি শিব ও বিষ্ণু মন্দির এই স্থানে অবস্থিত জানা যায়।

ঘুরিষা (শ্রীপুর)ঃ বোলপুর ষ্টেশন হইতে ইলামবাজার হইয়া দুবরাজপুর যাইবার পথে এই গ্রাম অবস্থিত ; ইলামবাজার থানার অন্তর্গত বীরভূমের অন্যতম বৃহৎ গ্রাম। এই গ্রামে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের বাস ও চতুষ্পাঠী আছে। গ্রামের মধ্যে 'বড় মঠে'র রঘুনাথজীর চার-চালা মন্দিরটি বীরভূমের অন্যতম প্রাচীন মন্দির, ১৫৫৫ শকাব্দে (১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে) এই মন্দিরটি রঘুনাথজীর উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়। কথিত হয় যে বর্গীর হাঙ্গামাকালে এখানের দেবমূর্তি অপহৃত হইবার পর সাম্প্রতিককালে এই মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মন্দির গাত্রে নিম্ন বর্ণিত লিপি উৎকীর্ণ আছে ঃ—

"রঘুত্তমাচার্য বিচিত্র মন্দিরম্,
রঘুত্তম প্রীতি সমৃদ্ধি বর্দ্ধনম্।
হরাস্য কামাস্ত্র তিথি প্রবর্ত্তিতে,
শাকে বিনির্মিতং নমাম শিল্পীনা॥"

এই মন্দির ৺রঘুত্তম ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের উত্তর ও পূর্বদিকে প্রবেশ পথ রহিয়াছে এবং এই দুই দিকের ফলকের উপর অলঙ্করণ আছে। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে প্রতিষ্ঠাফলক নিবিষ্ট আছে।

মন্দিরের পূর্বদিকে দ্বারোপরি বৃষারূঢ় শিব, কালী, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যারূপে বর্ণিতা দেবীগণের মন্দিরফলকের মধ্যে আবির্ভাব লক্ষণীয়। উত্তর দিকের প্রবেশ পথের উপর রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্যাবলী দর্শনীয়। মন্দিরের মৃৎফলকগুলির আকার কিছু বৃহৎ, পূর্বদিকে রাবণ, রাম, কালী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, ত্রিবিক্রম, রাম,

বলরাম, মনসা, বৃষোপরি শিব-পার্বতী, মহালক্ষ্মী, দুর্গা-মহিষাসুরমর্দিনী এবং (উত্তরে) বস্ত্রহরণ, নবনারীকুঞ্জর, রাসমণ্ডল, গজেন্দ্রমোক্ষ, দুর্গা, বিষ্ণু অনন্তশায়ী, বলরাম, কালীয়দমনরত কৃষ্ণ এবং গোচারণে কৃষ্ণ প্রভৃতির প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে।

গ্রামের মধ্যে ১১৪৫ বঙ্গাব্দে ৺ক্ষেত্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত নবরত্ন মন্দির শ্রীশ্রীগোপাল ও লক্ষ্মী-জনার্দন বিগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। প্রবেশ দ্বার পূর্বদিকে। প্রবেশ পথের উপরিভাগে সংকীর্তনরত শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ও বামপার্শ্বে ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রতিকৃতি ক্ষোদিত। উপরিভাগে লম্বা ফলকের মধ্যে সিংহাসনে উপবিষ্ট রাম-সীতা, দুর্গা ইত্যাদির প্রতিকৃতি আছে। অন্যান্য ফলকের মধ্যে দশমহাবিদ্যা, দশাবতার, রাধাকৃষ্ণ, ইউরোপীয় সৈনিকবৃন্দ, ইউরোপীয় বেশবাসে সজ্জিতা মহিলা ইত্যাদির রূপায়ণও দর্শনীয়।

গ্রামের মধ্যে অবস্থিত অনাদিলিঙ্গ শিবের মন্দিরটি সাম্প্রতিককালে নির্মিত।

ঘুরিষা গ্রামের ইছাপুর মৌজায় 'বুড়ো রায়ের থানে' একটি পাল-যুগের ক্ষয়িষ্ণু দুর্গামূর্তি ও একটি জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি আছে জানা যায়। বর্তমানে ঐগুলি গ্রাম দেবতারূপে পূজিত হইতেছে।

চণ্ডীদাস-নান্নুর : নান্নুর থানার মধ্যে অবস্থিত এই গ্রাম পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাসের জন্ম ও সাধনার স্থানরূপে পরিগণিত হইয়া বর্তমানে চণ্ডীদাস-নান্নুর নামে পরিচিত। বাঙ্গালাদেশে প্রাপ্ত বিভিন্ন পুঁথির ভণিতার মধ্যে দুই-তিন জন চণ্ডীদাসের উল্লেখ পাওয়া যায় যথা, বড়ু, দ্বিজ এবং দীন,—এঁদের প্রত্যেকের নামের সঙ্গে 'চণ্ডীদাস' শব্দ যুক্ত। চণ্ডীদাস এখানে আসল নাম বা উপাধি নয়।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচয়িতা বাশুলী সেবক 'বড়ু চণ্ডীদাস' নামে যে একজন কবি ছিলেন এবং তাঁহার জন্ম বাঁকুড়া জেলার ছাতনাতেই এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা মোটামুটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

বাঙ্গালার গীতিকাব্যের লীলায়িত ধারার প্রবর্তক এবং পদাবলী স্রষ্টা দ্বিজ চণ্ডীদাস যে এককালে এই নান্নুরে বসবাস করিয়াছিলেন এই বিষয়ে পণ্ডিতেরা এখন একমত। কীর্ণাহার, নান্নুর এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চণ্ডীদাস সম্পর্কে বহু জনশ্রুতি আছে। চণ্ডীদাসের রজকিনী প্রেম কাহিনী, চণ্ডীদাসের সাধন-ভজন কাহিনী এবং চণ্ডীদাসের মৃত্যু কাহিনী ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রবাদ-কিংবদন্তী এই দুই গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সম্প্রতি হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার রচিত

'কেতুগ্রামের কবি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' শীর্ষক এক প্রবন্ধে বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামই যে চণ্ডীদাসের জন্মস্থান এবং সেখান হইতে কবি নান্নুরে আসিয়া বসবাস করেন সে সম্বন্ধে যুক্তিতর্ক দ্বারা মত প্রকাশ করিয়াছেন। (পৃঃ ৪০-৪৭ 'বিশ্বভারতী পত্রিকা', শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৫।) কেতুগ্রামে জনশ্রুতি আছে যে চরণদাস ঠাকুর নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণ কেতুগ্রামে পূজা অর্চনা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। তাঁর কাব্য সাধনার মাধ্যমে তাঁর ইষ্টদেবী মা চণ্ডীকে জনসাধারণের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি 'চণ্ডীদাস' নামে খ্যাত হন। কেতুগ্রামের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত 'চণ্ডী ভিটাই' এ চণ্ডীদাসের বাস্তুভিটার ধ্বংসস্তূপ সে সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে। আরও কথিত হয় গ্রামের নীচ জাতীয়া এক বিধবাকে বিবাহ করিবার ফলে গ্রামে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হইলে চণ্ডীদাস স্ব-পূজিতা বিশালাক্ষী দেবীকে লইয়া কেতুগ্রাম হইতে নান্নুরে আসিয়া এক বন্ধুর গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। ইহার ফলে কেতুগ্রামের অধিবাসীরা নান্নুর গ্রাম আক্রমণ করিলে নান্নুরের গ্রামবাসীরা ঐ আক্রমণ প্রতিহত করেন। তখন কেতুগ্রামের অধিবাসীরা ব্যর্থমনোরথ হইয়া কেতুগ্রামের পার্শ্বে 'মড়াঘাট' হইতে বহুলাক্ষী দেবীকে তুলিয়া আনিয়া গ্রামমধ্যে চণ্ডীদাসের পৌরোহিত্যেই এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গাপূজার সময়ে নান্নুরে বিশালাক্ষী দেবীর চারদিন ব্যাপী পূজা হয়। এই পূজায় মহানবমী পূজার দিন কেতুগ্রামের তিলিদের পূজাই এখনও সর্বাগ্রে গৃহীত হইয়া কেতুগ্রামের সহিত নান্নুরের প্রাচীন সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

কেতুগ্রামে 'চণ্ডীদাসের ভিটা' আছে এবং ভূপাল নামে রাজার রাজবাড়ীর প্রকাণ্ড ধ্বংসস্তূপ এই গ্রামের মধ্যে দেখা যায়। ভূপাল জাতিতে তিলি ছিলেন, বর্তমানে তাঁহার বংশধরেরাই নান্নুরে বিশালাক্ষী দেবীর পূজা পাঠাইয়া দেন। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেতুগ্রাম হইতে আরও প্রবাদ এবং দলিল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া এই দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হন যে কেতুগ্রামের চণ্ডীদাসই নান্নুরের বিখ্যাত কবি চণ্ডীদাস এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' তাঁহারই রচনা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অব্যবহিত পূর্বে এই চণ্ডীদাস জীবিত ছিলেন এবং ফুলিয়ার কবি কৃত্তিবাসের সহিত তাঁহার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল এই সমস্ত তথ্যাদিও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সংগ্রহ করেন।

চণ্ডীদাস-নান্নুরের যেখানে বাশুলী মন্দিরাদি আছে এবং যে স্থানটি কবি চণ্ডীদাসের ধর্ম সাধনার সহিত বিজড়িত সেই উচ্চ ঢিবিটি মন্দিরাদি

সহ ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার সংরক্ষণাধীনে আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপক কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী মহাশয়ের পরিচালনায় প্রথমে এই ঢিবিতে সামান্য খননকার্য পরিচালিত হয়। এই খননকার্যের বিবরণ '*Excavations at Nanoor*' শীর্ষক এক প্রবন্ধে *Calcutta Review*, (*March 1950*) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সাম্প্রতিককালে নানুরের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইয়া ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার (পূর্বচক্র) পরিচালনায় এই স্থানে এক খননকার্য পরিচালিত হয়। খননকার্যের ফলে এই স্থানে আদি-ঐতিহাসিক কাল হইতে ঐতিহাসিক কাল তথা মধ্যযুগ পর্যন্ত সাংস্কৃতিক বিকাশের চিহ্ন পরিস্ফুট। এইখানে সর্ব নিম্নস্তর হইতে লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্র, সাধারণ কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্র এবং ধূসর বর্ণের মৃৎপাত্রের ভগ্ন নিদর্শন উদ্ঘাটিত হয়। মৃৎপাত্রগুলির আকৃতি শান্তিনিকেতনের নিকট মহিষদলে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রগুলির অনুরূপ।

নানুরে ঢিবির উপর ১৪টি শিবমন্দির মূল বাশুলী মন্দিরসহ বর্তমান। মন্দিরগুলির মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ চার-চালা দেউল —বাশুলীর মন্দিরটি সাধারণ সমতল ছাদবিশিষ্ট দালান মন্দির। এই সমস্ত মন্দিরমধ্যে উত্তরদুয়ারী দুইটি আট-চালা মন্দিরের সম্মুখের দিকে মৃৎফলকের উপর অলঙ্করণ আছে দেখা যায়। বর্তমানে এগুলির মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। অলঙ্করণের মধ্যে কৃষ্ণলীলা, দশাবতার, জগদ্ধাত্রী, সঙ্গীতঙ্গ ইত্যাদির দৃশ্যাবলী বা প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ।

ঢিবির উপর কতকগুলি ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি রক্ষিত আছে দেখা যায়। মূর্তিগুলির মধ্যে আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দীর শিল্প-শৈলী অনুসরণে নির্মিত বিষ্ণু, সূর্য ইত্যাদির মূর্তি আছে।

মূল বাশুলী মন্দিরমধ্যে যে দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন তাঁহার দুই হস্তে বীণা ও অপর দুই হস্তে পুস্তক এবং অক্ষমালা দর্শনীয়। ললিতাসনে উপবিষ্টা দেবীর পদতলে অমৃতঘট এবং পদ্মাসনের নিম্নে একটি ভক্তের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। দেবী বাগীশ্বরীর মূর্তি সম্ভবতঃ এই মূর্তিটি। এই প্রসঙ্গে 'অগ্নিপুরাণে'র ৫০শ অধ্যায়ের ১৬ শ্লোকের শ্লোকার্ধে উল্লিখিত 'পুস্তাক্ষমালিকাহস্তা বীণাহস্তা সরস্বতী' শ্লোক স্মরণ পূর্বক এই মূর্তিটিকে সরস্বতী মূর্তিরূপে গণ্য করা চলে।

পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাস তন্ত্রযানী সহজ-সাধকরূপেও বিশেষ

প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রজকিনী 'রামীর' সঙ্গে প্রেমের মাধ্যমে এই সহজিয়া সাধনার মর্ম কথাই ব্যক্ত। এই প্রসঙ্গে বজ্রযানী বৌদ্ধদের 'পঞ্চকুলে'র মধ্যে অন্যতম 'রজকী'কুলের বিশেষ সাধনার ধারা এই কিংবদন্তীর মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে এই ধারণাও হয়। বীরভূমের এই অঞ্চলে এককালে তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব ও সহজিয়া সাধনার ধারা এই সমস্ত জনশ্রুতির মাধ্যমে প্রতিভাত।

চন্দনপুর ঃ বোলপুর থানার অন্তর্গত এই গ্রাম বোলপুর হইতে প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে অজয় নদীতীরে অবস্থিত সুপুর গ্রাম সংলগ্ন। এই গ্রামে একটি ইষ্টকনির্মিত দেউল আছে। ১৭৮৬ শকাব্দে বা ১২৭০ বঙ্গাব্দে (১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে) এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাফলকে "শ্রীশ্রীশিবদাস রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়" এই কয়টি শব্দ উৎকীর্ণ আছে। পূর্বদুয়ারী এই শিবমন্দিরের প্রবেশ পথের উপর মধ্যস্থলে উপবিষ্ট রাম-সীতা, বামপার্শ্বে ইউরোপীয় শিল্প-রীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত দশাবতার-গণের প্রতিকৃতি যথা কল্কি, জগন্নাথ, বলরাম, পরশুরাম, ত্রিবিক্রম ইত্যাদি এবং দক্ষিণ পার্শ্বে দশমহাবিদ্যাদেবীগণের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। রাম-সীতা ফলকের উপরিভাগে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন পরিত্যাগের দৃশ্যাবলী দর্শনীয়।

এই মন্দিরের নিকটেই ধর্মঠাকুরের 'থান' নির্দিষ্ট আছে।

চারকলগ্রাম ঃ নানুরের ৬ মাইল (৯.৬ কিলোমিটার) পূর্বে, নানুর থানার অন্তর্গত এই বর্ধিষ্ণু, ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের অনেকগুলি পুরাকীর্তির ভিতর তিনটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি ব্রাহ্মণপাড়ার ইষ্টকনির্মিত ও বর্তমানে পোড়ামাটির সামান্য অলংকরণযুক্ত, পূর্বমুখী ভগ্ন নবরত্ন মন্দির। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৭ ফুট (৫.১ মিটার) ও উচ্চতায় আনুমানিক ৩৫ ফুট (১০.৫ মিটার) এ দেবালয়টি ব্রাহ্মণডিহির মতই ('ব্রাহ্মণডিহি' নিবন্ধ দ্রষ্টব্য) এক দীর্ঘাকৃতি নবরত্ন মন্দিরের বিশিষ্ট শৈলীতে নির্মিত। চতুর্দিকের ত্রিখিলানযুক্ত দালান ও চূড়ার অধিকাংশই এখন ভগ্ন। গর্ভগৃহের ছাদ চারি দেওয়ালসংলগ্ন খিলান ও কেন্দ্রীয় গম্বুজের উপর রক্ষিত। দ্বিতীয়টি চট্টোপাধ্যায় পাড়ায় অবস্থিত, পোড়ামাটির অলংকরণযুক্ত, পূর্বমুখী, পঞ্চরত্ন এক শিবমন্দির যাহা, লিপি-ফলক অনুসারে, ১২৪৫ বঙ্গাব্দে ৺গৌরীচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১২ ফুট (৩.৬ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ২৫ ফুট (৭.৫ মিটার), এই বহুল অলংকৃত দেবালয়ের নির্মাণব্যয় যে বর্তমানের তুলনায় কত অল্প ছিল তাহা গর্ভ-গৃহের পশ্চিম দেওয়ালে উৎকীর্ণ এক বিরল লিপিতে উল্লিখিত আছে।

লিপিটি নিম্নরূপ—"শ্রীশ্রী৺উমাকান্তেশ্বর শিবায় নমঃ | শ্রীদেবীচরণ চট্টোপাধ্যায় স্থাপীত | সন ১২৪৫ সাল তারিখ ১১ আসাড় | এই কারখানার খরচ হরেক দফায় | ৪৪৫৷৵. টাকা।" এ মন্দিরের স্খ-ভাগে নিবদ্ধ পৌরাণিক, সামাজিক ও কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পোড়ামাটির বহু মূর্তি ভাস্কর্যের শিল্প-শৈলী কিন্তু আধুনিক ও স্থূল প্রকৃতির। তৃতীয় পুরাকীর্তিটি এ মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণে অবস্থিত সমতল ছাদের এক পাকা চণ্ডীমণ্ডপ যাহার নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠালিপিটি তথ্যবহুল ও অভিনিবেশ-যোগ্য। "শ্রীশ্রী৺তুর্গা শিব শ্রীচরণ সরণং | শ্রীদেবীচরণ দেবশর্ম্মণং তদ্ পুত্রাঃ | শ্রীহরিনারায়ণ দেবশর্ম্মনঃ উত্তরাধিকারী | গণ সকলে ভক্তিপূর্বক নির্ব্বিরোধে | সারদিয় মহাপূজা করিবে এই চণ্ডীমণ্ডপ | নির্ম্মিত শ্রীব্রজনাথ রাজ ও শ্রী | গোপীনাথ রাজ সাং সাওতা সন ১২৬৬ সাল | তারিখ ১৩ আস্বীন বুধবার।" (এই নিবন্ধ পূর্ত বিভাগের যুগ্ম সচিব শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রদত্ত বিবরণের ভিত্তিতে লিখিত।)

ছিনপাইঃ তুবরাজপুর থানার অন্তর্গত তুবরাজপুর হইতে সামান্য কিছু উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এই গ্রাম অণ্ডাল-সাঁইথিয়া শাখা রেলপথের এক ছোট ষ্টেশন। গ্রামটি অবশ্য খুব ছোট নয়।

ছিনপাইএর 'মিত্রপাড়ায়' দক্ষিণতুয়ারী এক পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। গ্রামের 'চাষাপাড়ায়' ১৬৮১ শকাব্দে (বঙ্গাব্দ ১১৬৬ সাল) প্রতিষ্ঠিত এক শিবমন্দিরের সম্মুখের দিকে মৃৎফলকের উপর কিছু অলঙ্করণ আছে। সিউড়ী-তুবরাজপুর সড়কের পশ্চিমদিকে একটি নূতন শৈলীর মন্দির দৃষ্ট হয়। এখানে তুই বিপরীতমুখী চার-চালা মন্দিরের মধ্যস্থলে সমতল ছাদবিশিষ্ট এক দালান নির্মিত হইয়া তুইটি মন্দিরের সংযোগ সাধন করিতেছে। এই সমস্ত মন্দির ব্যতীত এই গ্রামে আরও কয়েকটি সাধারণ চার-চালা মন্দির আছে।

সাম্প্রতিককালে এই গ্রাম হইতে মধ্য প্রস্তরযুগে ব্যবহৃত প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হইয়া গ্রামটির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

জয়দেব-কেন্দুলীঃ প্রসিদ্ধ 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা কবি জয়দেব কোন কোন গানের ভণিতায় নিজেকে 'কেন্দুবিল্ব সম্ভব রোহিণীরমণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই উল্লেখ এবং আনুষঙ্গিক জনশ্রুতির মাধ্যমে অজয় নদীতীরে অবস্থিত ইলামবাজার থানার অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব বা কেঁতুলী গ্রাম কবি জয়দেবের 'অভিজন' অর্থাৎ পূর্বপুরুষের নিবাস বা জন্মস্থানরূপে চিহ্নিত হইয়া থাকে। এই গ্রাম এই কারণে এখন বীরভূমের মধ্যে প্রসিদ্ধ স্থানরূপে পরিগণিত। সেন নৃপতি লক্ষ্মণ

সেনের সভাকবিরূপে জয়দেব মিশ্রের প্রসিদ্ধি আছে। কবি জয়দেব সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতিও প্রচলিত।

গ্রামের মধ্যে নদীতীরে অবস্থিত কুশেশ্বর শিবমন্দির বর্তমান। আধুনিককালের এই মন্দিরে অষ্টদল পদ্মাঙ্কিত এক পাষাণখণ্ড আছে, কথিত হয় জয়দেব এই যন্ত্রে ভুবনেশ্বরী মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। অজয় তীরের একটি ঘাটকে লোকে আজিও 'কদম্বখণ্ডীর ঘাট' বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। জনশ্রুতি আছে কবি জয়দেব এই ঘাটেই রাধামাধব বিগ্রহ প্রাপ্ত হন এবং কেন্দুবিল্ব গ্রামের এক মন্দিরে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বৃন্দাবন যাত্রাকালে সেই যুগলবিগ্রহ লইয়া যান কথিত হয়। এখানের সুবিখ্যাত নবরত্ন মন্দিরে যে বিগ্রহের পূজা হয় তিনি শ্রীরাধাবিনোদ নামে পরিচিত। কিংবদন্তী আছে এই বিগ্রহ পূর্বে অজয় নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত 'শ্যামারূপার গড়ে' প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিনোদ নামে জনৈক রাজা এই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। 'শ্যামারূপার গড়' জন-বসতিহীন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া পড়িলে এবং অজয় নদী পার হইয়া সেবায়েতগণ নিত্য পূজার জন্য প্রত্যহ সেখানে যাতায়াত করিতে অস্বীকৃত হইলে বর্ধমানের রাজা এই যুগলবিগ্রহ কেন্দুবিল্বের শূন্য মন্দিরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। বিগ্রহের বর্তমান মন্দির বর্ধমানের মহারাণী নৈরাণী দেবী ১৬০৫ শকাব্দে (মতান্তরে ১৬১৪ শকাব্দে) অর্থাৎ ১৬৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বা ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন কথিত হয়। বর্তমানে মন্দিরটি ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার সংরক্ষণাধীনে আছে। মন্দিরের সম্মুখে মৃৎফলকের উপর সুন্দর অলঙ্করণ আছে। বাম পার্শ্বের প্রবেশ তোরণের উপর শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, বায়ু, যম, ইন্দ্র প্রভৃতি দিকপাল এবং দশাবতারগণের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। অন্য খিলান-গুলির উপর রামায়ণের ঘটনাবলীই বেশী; যথা জটায়ু কর্তৃক সীতার উদ্ধার প্রচেষ্টা ইত্যাদি প্রাধান্য পাইয়াছে। ইহা ছাড়া সাধু-সন্ত, দ্বারপাল ইত্যাদির প্রতিকৃতি এবং কৃষ্ণলীলার ঘটনাবলীও উৎকীর্ণ আছে।

মন্দির-পশ্চাতে একটি পিতলের রথের অবস্থিতি দর্শনীয়। রথের গায়ে বিভিন্ন প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ।

গ্রামের পশ্চিম দিকে অবধূত কাঙ্গাল খেপাচাঁদের পঞ্চদশমুখী সিদ্ধাসনের অস্তিত্ব দর্শনীয়। মন্দির-পার্শ্বে অবস্থিত শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে আগত রাধারমণ ব্রজবাসী নামে জনৈক সাধু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মঠ এই গ্রামের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। এই গ্রামে পৌষ সংক্রান্তির সময় জয়দেবের স্মরণে একটি বড় মেলা হয় এবং বহু বাউলের সমাবেশ ঘটে।

সাম্প্রতিককালে কবি জয়দেবের জন্মস্থান লইয়া মতভেদ দেখা যায়। ওড়িশার পণ্ডিতবর্গ যুক্তিতর্ক সহকারে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে কবি জয়দেবের আসল জন্মস্থান পুরী জেলার বালীঅন্টা থানার অন্তর্গত প্রাচী নদীতীরে অবস্থিত 'কেন্দুলী শাসন'। ঐ স্থানের জয়দেবের সমসাময়িক প্রত্নকীর্তিসমূহ এই মতবাদকে আরও সুদৃঢ় করিতেছে ঐ সমস্ত পণ্ডিতবর্গের ধারণা। *Dr. N. K. Sahu* সম্পাদিত ভুবনেশ্বর হইতে 'জয়দেব সাংস্কৃতিক পরিষদ' দ্বারা প্রকাশিত জয়দেব স্মারক গ্রন্থের (*'Souvenir on Sri Jayadeva'*) মধ্যে সন্নিবেশিত প্রবন্ধাদি দ্রষ্টব্য। এই প্রসঙ্গে *Indian Archaeology 1964-'65—A Review* তথ্যপঞ্জীর ৩২-৩৩ পৃষ্ঠায় নথিভুক্ত তথ্যও উল্লেখযোগ্য।

জলন্দী : নানুর থানার অন্তর্গত এই গ্রাম বোলপুর হইতে ব্যাঙ-চাতরা যাইবার পথে পড়ে। গ্রাম্যপথে বর্ষাকালে যাতায়াত কষ্টসাধ্য। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' সামন্তশেখর রাজার রাজধানীরূপে 'জলন্দার গড়ের' উল্লেখ আছে। জলন্দী সম্ভবতঃ সেই স্মৃতিবহ। গ্রামের মধ্যে 'ফৌজদার-পাড়া'য় একটি আট-চালা শিবমন্দির আছে। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে পশ্চিমদুয়ারী তিনটি মন্দির পাশাপাশি আছে। মধ্যেরটি পঞ্চরত্ন মন্দির। মন্দিরের ফলকে রামসীতা, অবতারগণের প্রতিকৃতি এবং দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী উৎকীর্ণ আছে। পাশের দুইটি মন্দিরের মধ্যে একটি 'দেউল' রীতির মন্দিরের প্রবেশ পথের খিলানের উপর মন্দিরগাত্রে নৌকাবিহারের দৃশ্য প্রতিফলিত, শিল্পরীতিতে ইউরোপীয় বেশবাসে সজ্জিত নর-নারীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'দেউল'টি সমকালীন বলিয়া ধারণা।

জাজীগ্রাম : মুরারই থানার অন্তর্গত বীরভূমের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের শেষ সীমায় অবস্থিত জাজীগ্রাম একটি বর্ধিষ্ণু পল্লী। শক্তি উপাসনার অন্যতম কেন্দ্ররূপে জাজীগ্রামের প্রসিদ্ধি আছে। এই গ্রামে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ইষ্টকনির্মিত অলঙ্কারবিহীন চার-চালা মন্দিরের অবস্থিতির কথা অধ্যাপক ডেভিড ম্যাককাচ্চন তাঁহার *'The Temples of Birbhum'* প্রবন্ধে (*The Visvabharati Quarterly* পত্রিকার *Vol 31, No. 4 p-11* এ প্রকাশিত) উল্লেখ করিয়াছেন। সমতল ছাদবিশিষ্ট আর একটি মন্দিরের জীর্ণ অবস্থার বর্ণনা এই প্রবন্ধে আছে (পৃঃ ২৬ দ্রষ্টব্য)।

জীবধরপুর : সিউড়ী থানার অন্তর্গত এই গ্রাম সিউড়ীর প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। জীবধরপুর অঞ্চল হইতে আদি, মধ্য ও শেষ

প্রস্তরযুগে ব্যবহৃত প্রস্তরায়ুধ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের পক্ষ হইতে পরিচালিত সমীক্ষার ফলে আবিষ্কৃত হইয়া ঐ স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (*Indian Archaeology 1963-'64—A Review, Ed. by A. Ghosh p-59* দ্রষ্টব্য।)

জুবুটীয়া : নানুর থানার অন্তর্গত এই গ্রাম কীর্ণাহার হইতে দাসকলগ্রাম যাইবার পথে অবস্থিত। এককালে গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল। জনশ্রুতি আছে জুবুটীয়ায় জপেশ্বর নামে এক জমিদার ছিলেন, মুসলমান আক্রমণের ফলে নিহত হন। এই গ্রামের পশ্চিমদুয়ারী জপেশ্বর শিবমন্দির প্রায় ৭/৮ শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা, কিন্তু মন্দিরের স্থাপত্য-শৈলী দেখিয়া ঐরূপ প্রাচীন মনে হয় না। অবশ্য মন্দিরটি এক উচ্চ ঢিবির উপর অবস্থিত। মন্দির চত্বরমধ্যে অবস্থিত দক্ষিণদুয়ারী এক চার-চালা মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর অলঙ্করণ দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরটি ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় জানা যায়। সাম্প্রতিককালে মন্দিরটির সংস্কার সাধন হয়। রামায়ণের ঘটনাবলী, পুষ্প-সজ্জা ইত্যাদি ফলকের মধ্যে ক্ষোদিত আছে। সংস্কারসাধনের সময় চুনের প্রলেপ লেপনের ফলে অলঙ্কৃত মৃৎফলকগুলির সৌন্দর্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

জোফলাই : দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত এই গ্রাম দুবরাজপুর হইতে প্রায় ৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত। এই গ্রামে ভক্তচূড়ামণি বৈষ্ণব কবি জগদানন্দ ঠাকুরের জন্মস্থান এবং এই কারণে বৈষ্ণবদিগের নিকট পরম তীর্থক্ষেত্র। জগদানন্দের আবির্ভাবকাল নির্দিষ্টরূপে নির্ণীত হয় নাই, তবে তাঁহার শ্রীখণ্ড নিবাসী বংশধরগণের নিকট হইতে জানা যায় যে ১৭০৪ শকাব্দের ৫ই আশ্বিন (১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ) কবিবর স্বর্গগত হন। জগদানন্দ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ছিলেন। এই গ্রামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিগ্রহ এবং ৺গোপীনাথ জীউএর মন্দির বর্তমান। এই মন্দিরের অনতিদূর কবির বাস্তুভিটার ধ্বংসস্তূপরূপে চিহ্নিত হয়।

ডাবুক : ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত এই গ্রামে রামপুরহাট হইতে বীরচন্দ্রপুর যাইবার পথে বীরচন্দ্রপুরের কিছু পশ্চিমে প্রায় ২ মাইল গ্রাম্য পথে গমন করিলে পৌঁছান যায়। বর্ষাকালে এই গ্রাম্য পথে পরিভ্রমণ কষ্টসাধ্য। গ্রামের মধ্যে অবস্থিত সুউচ্চ মন্দিরমধ্যে অনাদিলিঙ্গ ডাবুকেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। কথিত হয় কৈলাসানন্দস্বামী নামে এক সন্ন্যাসী বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই

গ্রামে উপস্থিত হন। ভিক্ষালব্ধ অর্থে সঞ্চিত প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়ে এই বিরাট মন্দিরের নির্মাণকার্য ১২৮৭ বঙ্গাব্দে সমাপ্ত হয়। মন্দিরটি সুউচ্চ, চার-চালা অনুযায়ী নির্মিত, দ্বারোপরি মন্দির প্রতিষ্ঠাফলক নিবিষ্ট আছে। বীরভূমের অন্যতম উচ্চ মন্দিররূপে এই মন্দির গণ্য করা যায়। মন্দির-প্রাঙ্গণের চারিদিকে অতিথিশালা আছে। পূর্বে কাশ্মীররাজষ্টেট হইতে এই মন্দিরের জন্য বাৎসরিক ৬০০ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ নির্দিষ্ট ছিল।

এই মন্দির নির্মাণকালে ভূমধ্য হইতে দুইটি বিষ্ণু মূর্তি আবিষ্কৃত হইবার কাহিনী শুনা যায়, বর্তমানে ঐগুলির অস্তিত্ব জানা যায় না। মন্দিরচত্বর মধ্যে এক বিল্ববৃক্ষ তলে কয়েকটি প্রস্তর মূর্তির ভগ্ন অংশ পড়িয়া আছে। মন্দিরটির উচ্চতা আনুমানিক ৮০ ফিটের মত।

ঢেকাঃ ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত এই গ্রাম কলেশ্বর হইতে প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বীরভূমের অন্যতম প্রধান জমিদার রাজা রামজীবনের আবাসস্থলরূপে এই গ্রাম প্রসিদ্ধ। রামজীবনের পুত্র রামচন্দ্র ঢেকার যুদ্ধে আলিনকী খাঁ কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন প্রবাদ আছে। ঢেকার 'রামসাগর' নামে সরোবর রামজীবনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এক বিরাট জলাশয়। আলিনকী কর্তৃক আক্রমণের ফলে ঢেকা, কলেশ্বর ও তারাপুরের বহু প্রাসাদ ও দেবায়তন লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়। রাজা রামজীবনের রাজধানী এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত, পূর্বে এই স্থানে 'সপ্ততল বিশিষ্ট' মন্দিরের অবস্থিতি সম্বন্ধে কাহিনী বর্তমান।

তাঁতিপাড়াঃ রাজনগর থানার অন্তর্গত এই গ্রাম সিউড়ী হইতে বক্রেশ্বর যাইবার পথে অবস্থিত। তন্তুবায়প্রধান এই বর্ধিষ্ণু গ্রাম রেশম বস্ত্র উৎপাদনের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। এই গ্রামের ধর্মঠাকুরের বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। ধর্মশিলাগুলির মধ্যস্থলে ধাতুনির্মিত কৌটা আছে। কৌটার ভিতর ছোট মার্বেল আকৃতির শ্বেতবর্ণ স্ফটিকজাতীয় স্বচ্ছ একটি বস্তু আছে। কথিত হয় এইটিই আসল ধর্মঠাকুর।

তারাপুর (তারাপীঠ)ঃ দ্বারকা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত প্রাচীন শাক্তপীঠ তারাপুর, বর্তমানে তারাপীঠ নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ। রামপুরহাট ষ্টেশন হইতে বাসে বা রিক্সায় সহজেই এইস্থানে যাওয়া যায়, রামপুরহাট হইতে এই স্থান প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

'প্রাণতোষণী তন্ত্র' মধ্যে বর্ণিত ৫১ পীঠস্থানের মধ্যে তারাপুর বা চণ্ডীপুরের কোন উল্লেখ না থাকিলেও কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত 'পীঠ নির্ণয়' নামে পুঁথির (১০৮৬৩ নং) মধ্যে

এই উল্লেখ আছে ঃ—'তারাক্ষ্যাং বামনেত্রং তারাখ্যা তারিণী পরা। উন্মত্তো ভৈরবস্তত্র সর্বলক্ষণ সংযুতঃ॥' 'শিবচরিত' গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত মহাপীঠের মধ্যে 'তারাপীঠে' সতীর 'নেত্রাংশ তারা' পতিত হইবার কাহিনী এবং দেবীর নাম 'তারিণী' ও ভৈরবের নাম 'উন্মত্ত' রূপে উল্লেখ আছে। দ্বিজ বংশীদাসের 'মনসামঙ্গলে' 'উগ্রতারা পীঠে' সতীর চক্ষুদ্বয় পতিত হইবার কাহিনী আছে ঃ—

'চক্ষুগুলা খসিয়া যে পড়িল যেখানে।
উগ্রতারা নাম তীর্থ বিখ্যাত ভুবনে॥'

এই সমস্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা পূর্বক ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় তারাপীঠ বীরভূম জেলার নলহাটীর নিকটবর্তী তারাপুর গ্রামে অবস্থিত এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (*Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Letters Vol XIV, No. 1, 1948* পত্রিকায় প্রকাশিত ডঃ সরকার রচিত '*The Sakta Pithas*' শীর্ষক প্রবন্ধের ৩৯, ৬২ এবং ৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

তারাপুরে মহামুনি বশিষ্ঠদেব সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন জনশ্রুতি আছে এবং এই কারণে তারাপীঠ সিদ্ধপীঠরূপেও গণ্য। পূর্বে তারা দেবীর মন্দির ও তাঁর শীলাময়ী মূর্তি এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

কথিত হয় যে ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ চীনদেশে গমনপূর্বক 'চীনাচার' মতে তারা সাধনা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া অবশেষে বহু তীর্থ ভ্রমণের পর তারাপুরে আসিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তারাপীঠের সহিত বশিষ্ঠের এই সম্পর্ক সম্ভবতঃ 'রুদ্রযামলের' মত বিখ্যাত তন্ত্র হইতে সংগৃহীত এই ধারণা হয়। এইস্থানে বশিষ্ঠদেবের সিদ্ধিলাভের স্থানও চিহ্নিত হয়।

আরও কিংবদন্তী আছে যে জয়দত্ত নামে এক বণিক দেবীর কৃপায় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দেবীর মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দির দ্বারকার প্লাবনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে পর ঢেকার রাজা রামজীবন বহু অর্থ ব্যয়ে নূতন মন্দির নির্মাণ করেন। অল্পদিন পরেই নদীতীরে ধ্বস নামিলে এই মন্দিরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বর্তমান মন্দিরটি বঙ্গাব্দ ১২২৫ সালে মল্লারপুর নিবাসী দানশীল ব্যবসায়ী স্বর্গীয় জগন্নাথ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই স্থানের প্রচলিত কিংবদন্তী এবং জনশ্রুতি বিশ্লেষণ পূর্বক প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠান ও পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। যাহা হউক, তারাপীঠ কালক্রমে তান্ত্রিক সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইয়া বহু তান্ত্রিক সাধকগণের বিচরণক্ষেত্র হইয়া উঠে। নাটোরের রাণী ভবানীর

পুত্র সাধক মহারাজ রামকৃষ্ণ এইখানে আসিয়া তান্ত্রিক সাধক আনন্দনাথের হস্তে দেবীর পূজার ভার অর্পণ করেন। পরে বীরভূম জেলার রাৎমা নিবাসী মোক্ষদানন্দ এই মন্দিরের প্রধান কৌলিকের পদ প্রাপ্ত হন। এই মোক্ষদানন্দের প্রধান শিষ্য হইলেন ভৈরবাধূত বামাচরণ যিনি 'বামাক্ষ্যাপা' নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বঙ্গাব্দ ১২৪০ সালে তারাপুরের নিকটবর্তী আটলা গ্রামে বামাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মোক্ষদানন্দের নিকট দীক্ষালাভের পর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং মোক্ষদানন্দের মৃত্যুর পর তারাপীঠের প্রধান কৌলিকের পদে ব্রতী হন ও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গত সন ১৩১৮ সালের ৩রা শ্রাবণ এই সাধক তাঁহার সাধনোচিত ধামে গমন করেন।

তারাপীঠের বর্তমান মন্দিরটি একটি সুউচ্চ আট-চালা উত্তরমুখী মন্দির। মন্দিরের সম্মুখভাগে ফুলপাথরের উপর সুন্দর অলঙ্করণ আছে। চার-চালার উপর চারিকোণে চারিটি ক্ষুদ্র চূড়া ন্যস্ত আছে, চারিটি রত্নের শেষ পরিণতি কি না কে জানে? মন্দিরটি ১৭৪০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। মন্দিরের প্রবেশ পথের মধ্য খিলানের উপর সপরিবারে দেবী মহিষাসুরমর্দিনীর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। বাম পার্শ্বের খিলানের উপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঘটনাবলী, ভীষ্মের শরশয্যা, অশ্বত্থামা হত কাহিনীর উপাখ্যানসমূহ বর্ণিত আছে। দক্ষিণ পার্শ্বের খিলানের উপর রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য ক্ষোদিত আছে। এ ছাড়া স্তম্ভগাত্রে এবং মন্দির পার্শ্বদেশে উপর হইতে নিম্নে লম্বালম্বিভাবে আরও উৎকীর্ণ ফলকের দ্বারা সজ্জিত দেখা যায়। এই সমস্তের মধ্যে কৃষ্ণলীলা, রামায়ণের ঘটনাবলী, গজলক্ষ্মী ও মনসা দেবীর প্রতিকৃতি, বলিদানের দৃশ্য, শিকার, শোভাযাত্রা ও যুদ্ধের দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ আছে। সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ জ্যামিতিক রেখাসমূহ, পত্রাবলী, মুখব্যাদানরত যক্ষ ইত্যাদির প্রতিকৃতি বিশেষ দর্শনীয়।

মন্দিরচত্বর মধ্যে অবস্থিত একটি প্রকোষ্ঠে বিষ্ণুর দুইটি প্রস্তরমূর্তি (আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর) পূজিত হয়। বর্তমানে এই পীঠস্থানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। যাত্রীসাধারণের জন্য ধর্মশালা আছে। সাধক বামাক্ষ্যাপার স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাদিও দ্রষ্টব্য।

তারাপুরের নাতিপূর্বে জয়সিংহপুর গ্রামে এক রাজা ছিলেন প্রবাদ আছে। জয়সিংহপুরের উত্তর-পশ্চিমে, গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে 'দাঁড়কের মাঠ' নামে এক শস্যক্ষেত্র আছে, তথায় রাজবাড়ীর ধ্বংসস্তূপ

নির্দেশিত হয়। নিকটবর্তী জমি হইতে প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্তির তথ্যাদি পাওয়া যায়।

তেজহাটী : নলহাটী থানার অন্তর্গত এই গ্রাম নলহাটীর কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। রামপুরহাট হইতে সরধা বাস রাস্তার ধারে এই গ্রামের মন্দিরগুলি অবস্থিত। সাধারণ চার-চালা রীতির শিব-মন্দির, সংস্কারের অভাবে জীর্ণদশায় পতিত হইতে চলিয়াছে। গ্রামের সরকার পরিবারের প্রতিষ্ঠিত রাস্তার দক্ষিণে ৩টি মন্দির (পশ্চিমদুয়ারী দুইটি ও পূর্বদুয়ারী একটি) এবং উত্তরে ২টি মন্দির (দক্ষিণদুয়ারী) আছে। উত্তরদিকে অবস্থিত দক্ষিণদুয়ারী মন্দিরদ্বারের উপর চুন-বালিতে শিবের ও দেবীর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। শিল্প-শৈলী মোটেই প্রশংসনীয় নয়। এইস্থানে একটি ধর্মঠাকুরের 'থান' বর্তমান। এই স্থান হইতে কিছুদূরে সড়কের উত্তর পার্শ্বে একটি পুষ্করিণী তীরে এইরূপ আরও একটি মন্দির আছে।

থুপসরা : নানুর থানার অন্তর্গত এই গ্রাম নানুর গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। গ্রামে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এক মন্দির আছে। মন্দিরটির তিনদিকে মৃৎফলকের উপর অলঙ্করণ আছে। দক্ষিণ দিকে প্রবেশ পথের উপর মন্দিরগাত্রে ভ্রাতৃগণসহ রাম-সীতার প্রতিকৃতি এবং এক যজ্ঞানুষ্ঠানের দৃশ্য উৎকীর্ণ। পশ্চিমে মহিষাসুরমর্দিনী এবং পূর্বে সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজাকে দেখা যায়। মন্দিরগাত্রে নিবদ্ধ অন্য ফলকগুলির মধ্যে অলঙ্করণ আছে।

দাঁড়কা : লাভপুর থানার অন্তর্গত এবং গণুটিয়ার নিকটে ময়ূরাক্ষী নদীতীরে দাঁড়কা বা দণ্ডকা গ্রামে দণ্ডেশ্বর নামে এক মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। এইস্থান হইতে ২।৩ মাইল দূরে অবস্থিত ঝলকা গ্রাম হইতে দশভুজা নৃত্যরতা চামুণ্ডা মূর্তির আবিষ্কারের কাহিনী লোকমুখে শুনা যায়।

দাসকলগ্রাম : নানুর থানার অন্তর্গত এই গ্রাম বীরভূম জেলার পূর্ব সীমানায় অবস্থিত। দাসকলগ্রাম রেলষ্টেশন হইতে (পূর্ব রেলপথের আহমদপুর-কাটোয়া শাখা) গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় যে স্থানে দুইটি শিব-মন্দির আছে তাহার দূরত্ব প্রায় সিকি মাইল। পূর্বদুয়ারী শিবমন্দির দুইটি আট-চালা, ক্ষুদ্র মিনারের আকৃতিবিশিষ্ট চূড়া এই মন্দিরচালের উপর বর্তমান। মন্দিরগাত্রে ফলকের উপর রামায়ণের ঘটনাবলী, পুষ্প-সজ্জা, দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী, দশাবতার, বাদ্য-বাদনরতা নারীমূর্তি, গরুড়বাহনোপরি বিষ্ণু ইত্যাদির প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ।

দুবরাজপুর ঃ অণ্ডাল-সাঁইথিয়া শাখা রেলপথে অবস্থিত দুবরাজপুর একটি বাণিজ্যপ্রধান স্থান। দুবরাজপুর থানার কর্মকেন্দ্র এইখানে অবস্থিত। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত 'মামা-ভাগিনা পাহাড়' দর্শনীয় এবং সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এখানে বিরাট বিরাট গ্রানাইট প্রস্তরখণ্ডগুলি বহুদূর ব্যাপী বিস্তৃত। চারি পার্শ্বের সমতল ভূমির মধ্যে এই ধরণের প্রস্তরখণ্ডের অবস্থিতি সহজেই বিস্ময়ের উদ্রেক করে এবং এই কারণে এইগুলির অবস্থিতি সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত। পাহাড়ের পাদদেশে পাহাড়েশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত, নাটমন্দিরসহ এই মন্দিরের কোন বিশেষ স্থাপত্য-শৈলী পরিলক্ষিত হয় না।

দুবরাজপুরে অনেকগুলি ইষ্টকনির্মিত শিবমন্দির বর্তমান। মন্দির-গুলির মধ্যে বাজারের নিকট অবস্থিত 'ত্রয়োদশরত্ন' সমন্বিত শিবমন্দিরটি দর্শনীয়। মন্দিরমধ্যে তিনটি শিবলিঙ্গ বৃষবাহনসহ প্রতিষ্ঠিত। প্রধান প্রবেশ পথের খিলানের উপর শিবের কৈলাস আক্রমণের ঘটনাবলী উৎকীর্ণ। পার্শ্বের লম্বমান ফলকগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি ক্ষোদিত। মন্দিরে দেবসান্নিধ্য লাভের জন্য পশুগণও ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে যেন এই ভাব ব্যক্ত। অন্য ফলকগুলির মধ্যে দেবদেবী, অবতার, সামাজিক এবং পৌরাণিক দৃশ্যাবলীসমূহ উৎকীর্ণ। মন্দিরের চূড়ায় মূর্তিসমূহ দণ্ডায়মান আছে। দ্বারের পার্শ্বে ইষ্টকগাত্রে কয়েকটি লিপি উৎকীর্ণ যথা ঃ—"খোদিত কারিকর শ্রীগোপিনাথ হাড়ি সাং দুবরাজপুর এবং ১২৯৬ সাল।" এই স্থানের হাড়িগণ যে এককালে মন্দির নির্মাণ-কার্যে নিপুণ ছিলেন তাহা বেশ চিত্তাকর্ষক। বর্তমানে ইঁহারা সমাজের নিম্নকোটি শ্রেণীভুক্ত।

দুবরাজপুরের 'ময়রাপাড়ায়' ৩টি ইষ্টকনির্মিত মন্দির আছে। মন্দির-গুলি দক্ষিণদুয়ারী। দুইপার্শ্বে অবস্থিত দুইটি 'দেউলে'র মধ্যে একটি ত্রয়োদশরত্ন মন্দির দণ্ডায়মান। দশাবতার, দেবী অন্নপূর্ণা, শিব, রাম-সীতা, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ঘটনাবলী, কৃষ্ণলীলা, শিববিবাহ, পুষ্পসজ্জা ইত্যাদির প্রতিকৃতির দ্বারা এই সমস্ত মন্দিরের মৃৎফলকগুলি অলঙ্কৃত।

'নামোপাড়া' বা 'ওঝা পাড়ায়' উত্তরদুয়ারী ৫টি শিবমন্দির আছে। 'পঞ্চ শিবালয়'রূপে এই মন্দিরগুলি গ্রামে পরিচিত। মধ্যের একটি 'ত্রয়োদশরত্ন মন্দির' শ্রেণীর এবং অন্যান্যগুলি 'দেউল' রীতির মন্দির। মধ্যের এই ত্রয়োদশরত্ন মন্দিরটির দুইপার্শ্ব বৃহৎ আকারের মৃৎফলক দ্বারা সজ্জিত। রামায়ণের ঘটনাবলী, নরসিংহ অবতার, নারদ, নৌকা-বিহার, গজপৃষ্ঠে শিকারী ইত্যাদির প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ।

'নামোপাড়ায়' নায়েক পরিবারের গৃহের নিকট আরও ৩টি মন্দির আছে। মধ্যেরটি 'নবরত্ন', সুন্দর অলঙ্করণ এই মন্দিরে আছে, তবে মন্দিরের অবস্থা জীর্ণ। শিব-বিবাহ, মহিষাসুরমর্দিনী, কালী ইত্যাদির প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। এই স্থানে একটি চার-চালা ও একটি 'দেউল' মন্দিরও আছে। চার-চালা মন্দিরটিতে চুন-বালির পলস্তারা দ্বারা জ্যামিতিক রেখাচিত্রসমূহ উৎকীর্ণ।

দেউলী: বোলপুর থানার অন্তর্গত অজয় নদীতীরে দেউলী এক পরিত্যক্ত গ্রাম। নদীর অপর তীরে বর্ধমান জেলায় অবস্থিত পাণ্ডু রাজার ঢিবির সুউচ্চ ধ্বংসস্তূপ বর্তমান। দেউলী গ্রাম হইতে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা (পূর্বচক্র) কর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধানের ফলে প্রত্ন-বস্তুসমূহ আবিষ্কৃত হইয়া এই স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। এই স্থান হইতে কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের এবং আদি ঐতিহাসিক যুগের মৃৎপাত্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গ্রামের এই সমস্ত ধ্বংসস্তূপের উপর একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মন্দির-সম্মুখে কয়েকটি দেবমূর্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিবার সংবাদ পাওয়া যায়। জনশ্রুতি আছে বৈষ্ণবকবি লোচনদাস এই স্থানের এক প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিতেন। দেউলীর নিকটবর্তী কাঁকুটিয়া গ্রামে 'লোচনের পাটে' লোচনদাস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেব বিগ্রহ তাঁহার বংশধরগণ কর্তৃক পূজিত হইতেছে। লোচনদাস কাঁকুটিয়ার শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমান মন্দিরটি ১৭৪৬ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় জানা যায়। মন্দিরটি 'দেউল' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীন মন্দিরের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরে পাল শিল্প-শৈলী অনুসারে নির্মিত এক বৃহৎ আকারের মহিষাসুরমর্দিনীর প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামবাসীদিগের নিকট ইহা 'খ্যাঁদা পার্বতী' নামে পরিচিত।

বঙ্গাব্দ ১৩২৩ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকায় মহারাজকুমার শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী কর্তৃক রচিত 'বীরভূমের অজয় তীরবর্তী ঐতিহাসিক সম্পদ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে দেউলীতে আবিষ্কৃত মূর্তিগুলির উল্লেখ আছে ও আলোকচিত্র প্রকাশিত

হইয়াছে। মূর্তিগুলি বাসুদেব, পঞ্চানন, শিব ও সাবিত্রীর মূর্তিরূপে গণ্য করা হইয়াছে। শিল্প-শৈলী দেখিয়া মূর্তিগুলিকে সেন পর্বে ক্ষোদিত বলিয়া অনুমান করা হয়। এই স্থানে দেবালয় অর্থাৎ মন্দিরাদির অবস্থিতি হইতে গ্রামটির 'দেউলী' এই নামকরণ হইয়াছে ধারণা হয়।

দেবগ্রাম : নলহাটী থানার অন্তর্গত আকালীপুর হইতে প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে একটি সুন্দর বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে শুনা যায়। প্রভামণ্ডলে পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের প্রতিকৃতিসহ এই বুদ্ধমূর্তিটি বর্তমানে অপহৃত। ('বীরভূম বিবরণ' ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৮ এবং ১২০ পৃষ্ঠার পর সন্নিবেশিত আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।)

গ্রামের পূর্বদিকে বৃক্ষতলে এখনও কয়েকটি ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি গ্রাম-দেবতারূপে পূজিত হইতেছে। কোন স্তম্ভের ভগ্নাংশ, উমা-মহেশ্বর মূর্তির ভগ্ন অংশ ইত্যাদি দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর শিল্প-শৈলী অনুসরণে এইগুলি নির্মিত।

দেবীপুর : ইলামবাজার থানার অন্তর্গত ইলামবাজারের পার্শ্ববর্তী এই গ্রাম। এইখানে এক মন্দিরে সুঙ্কেশ্বরী দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। বৌদ্ধতারামূর্তি বর্তমানে এই নামে পূজিতা হইতেছেন অনুমান করা হয়। এই স্থানে একটি দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি পূজিত হইতেছে জানা যায়।

নলহাটী : সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে অবস্থিত নলহাটী জংসন ষ্টেশন পূর্ব রেলপথের অন্যতম প্রধান ষ্টেশন। এখান হইতে একটি শাখা মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ পর্যন্ত গিয়াছে। স্থানটি বর্তমানে ব্যবসা-প্রধান এবং স্বাস্থ্যকর স্থানরূপে পরিগণিত, এইখানে অবস্থানের নিমিত্ত দুইটি ডাকবাংলো আছে। ষ্টেশনের পূর্বপার্শ্বে নিকটেই পূর্ত (সড়ক) বিভাগের বাংলো অবস্থিত। ষ্টেশনের পশ্চিমে প্রায় ১ মাইল দূরে 'ললাটেশ্বরী পাহাড়ের' উপর স্থানীয় উন্নয়ন আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে এক বাংলো আছে।

পাহাড়ের অগ্নিকোণে পার্বতী দেবীর বা দেবী ললাটেশ্বরীর মন্দির অবস্থিত। দেবী মন্দিরের অনতিদূরে পাহাড়ের উপর 'আনা শহীদ পীরে'র সমাধিস্থান বর্তমান।

'পীঠনির্ণয় (মহাপীঠনিরূপণম্)' তন্ত্রে উল্লেখ আছে :—

'নলাহাট্টাং নলাপাতো যোগীশো (পাঠান্তরে যোগেশো) ভৈরবস্তথা।
তত্রসা কালিকা দেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা ॥'

(পাঠান্তরে 'তত্রসিদ্ধির্নসংশয়ঃ')

তন্ত্রে উল্লিখিত এই উক্তি হইতে জানা যায় যে বিষ্ণুচক্র কর্তিত সতীর দেহাংশের 'নলা' (নুলো ; কনুইয়ের নিম্নভাগ, সংস্কৃত 'নলক' শব্দ হইতে উদ্ভূত; অর্থাৎ লম্বা অস্থি) পতিত হওয়ায় নলহাটীতে দেবী কালিকা এবং ভৈরব যোগীশ (যোগেশ) বিরাজ করিতেছেন। 'শিবচরিতের' মতে নলহাটী উপপীঠরূপে গণ্য, দেবীর শিরানালী পতিত হইবার কাহিনীর এবং দেবীর 'শেফালিকা' এবং ভৈরবের 'যোগীশ' নামে উল্লেখ এই গ্রন্থমধ্যে আছে। সাম্প্রতিককালে সংস্কৃত চার-চালা মন্দির মধ্যে পূজিত পাষাণ খণ্ডের মধ্যেই দেবী বিরাজিতা। মন্দিরে পূজা-অর্চনাদি বর্তমানে ভক্তগণের উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হয়। মন্দির-প্রাঙ্গণে যাত্রী-সাধারণের অবস্থানের জন্য ধর্মশালা আছে।

মারাঠা বর্গীদের হাঙ্গামাকালে নলহাটী বর্গীদের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পায় নাই। কথিত আছে, 'ললাটেশ্বরী টিলার' উপর প্রাচীন-কালে এক গড় ছিল, বর্গীরা সেইটি দখল করিয়া সেখানে তাহাদের 'আস্তানা' করে। সম্ভবতঃ নবাব-সৈন্যের আক্রমণে পর্যুদস্ত হইয়া বর্গীরা এই স্থান ত্যাগ করে। জনশ্রুতি আছে যে পাহাড়ের উপর যে পীরের সমাধি আছে, তিনি বর্গীদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া 'শহীদ' হন। এই গড়টি প্রাচীনকালে 'নলরাজগণের গড়' রূপেও পরিচিত ছিল। ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত 'সন্ধিগড় বাজার' বা 'সিন্ধুগড়' এবং চণ্ডীদাস-নান্নুর অঞ্চলেও 'নলরাজ' সম্বন্ধীয় প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই নলরাজগণ সম্বন্ধে অন্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

নলহাটীর পশ্চিমে অনতিদূরে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় বীরভূমের সীমান্ত প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান আছে। নলহাটীর প্রায় ৮৷১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত 'নাথ পাহাড়ে' নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীরা বাস করিতেন, তাঁহাদের নামানুসারে এই পাহাড়ের নাম 'নাথ পাহাড়' হয়। রাজা উদয়নারায়ণ এই পাহাড়ের উপর গিরিগোবর্ধনধারী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও মন্দিরাদি নির্মাণ করেন। বর্তমানে সেগুলি ভগ্নদশায় পতিত। 'নাথ-পাহাড়ের' দক্ষিণে চন্দ্রময়ী পাহাড়ে 'চন্দ্রময়ী' নামে এক দেবীর মন্দির আছে। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এক প্রস্তরখণ্ড 'দেবী চন্দ্রময়ী'রূপে অভিহিত।

নলহাটীর ললাটেশ্বরী টিলাটি আর একটি কারণে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। প্রাচীন, মধ্য ও শেষ প্রস্তরযুগে ব্যবহৃত নানা ধরণের প্রস্তরায়ুধ এই টিলার বিশ্লিষ্ট মাকড়া পাথরের মধ্য হইতে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক

পরিচালিত সমীক্ষার ফলে এই সমস্ত নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। (*Indian Archaeology 1964-'65, A Review, Ed. by A. Ghosh, p-46,* দ্রষ্টব্য।)

নাকড়াকোন্দাঃ খয়রাশোল থানার অন্তর্গত এবং খয়রাশোল গ্রামের প্রায় এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই গ্রামে জঙ্গলের মধ্যে (দেওগঞ্জ) একটি প্রাচীন ভগ্ন মন্দির ও নিকটে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে জানা যায়। স্থানটি 'পুরাতন বক্রেশ্বর' নামে খ্যাত।

নারায়ণপুরঃ রামপুরহাট থানার অন্তর্গত এবং রামপুরহাটের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় সাঁওতাল পরগণার সীমান্তে অবস্থিত এই গ্রাম। নারায়ণপুর গ্রামের ভিতর ব্রাহ্মণী নদীতীরে 'মল্লেশ্বর শিব' মন্দির আছে। এই স্থানে রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্বও শুনা যায়। নারায়ণপুরের পশ্চিমে 'সালবুনি' নামক স্থানেরও অনেক কাহিনী প্রচলিত। নারায়ণপুরের লৌহ ব্যবসার খুব প্রসিদ্ধি ছিল। নিকটবর্তী বলবন্তনগরে (বর্তমান নাম জয়পুর) একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে। রাজা উদয়নারায়ণ এই দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন শুনা যায়। এই অঞ্চলে উদয়নারায়ণ সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত।

পতণ্ডাঃ সিউড়ী থানার অন্তর্গত এবং পুরন্দরপুরের নিকট বক্রেশ্বর ও ময়ূরাক্ষী নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এই গ্রাম হইতে রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক পরিচালিত সমীক্ষার ফলে কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ, শেষ প্রস্তরযুগে ব্যবহৃত প্রস্তরায়ুধের কতিপয় শল্কসমূহ এবং চারিটি নব্য প্রস্তরযুগে ব্যবহৃত প্রস্তর কুঠার আবিষ্কৃত হয় এবং স্থানটির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়।

পাইকোড়ঃ মুরারই থানার অন্তর্গত এবং মুরারই-মিত্রপুর সড়কের ধারে অবস্থিত এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। মুরারই ষ্টেশন হইতে সহজেই বাস অথবা রিক্সায় এই গ্রামে আসা যায়। বীরনগরের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত 'প্রাচীকোট' অর্থাৎ পূর্ব সীমান্তবর্তী দুর্গ পরবর্তীকালে 'পাইকোড়' নামে অভিহিত হয় জনশ্রুতি আছে। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত আধুনিক কালে নির্মিত এক মন্দিরে 'জয়দুর্গা' দেবীরূপে অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী মূর্তি পূজিত হইতেছে। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পরিগণিতা 'ক্ষ্যাপা কালীর' পাষাণ মূর্তি সিন্দুর লেপিত অবস্থায় উন্মুক্ত বেদীর উপরে ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে বর্তমানে পূজিত হয়। এই দেবীর মাহাত্ম্য

অনেক এবং স্থানীয় গ্রামবাসী শ্রীকালিদাস শীল 'ক্ষেপাকালী মাহাত্ম্য' শীর্ষক এক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। সরস্বতী পূজার (শ্রীপঞ্চমী) পূর্বদিনে 'বাণব্রতের' অনুষ্ঠান পাইকোড়ের একটি প্রধান উৎসব এবং এই উপলক্ষে এখানে একটি মেলা বসে। এই সময় এই দেবীর এবং বুড়োশিবতলায় অবস্থিত বুড়োশিবের পূজা খুব ধূমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

পাইকোড় গ্রামের পুরাকীর্তিসমূহের মধ্যে আবিষ্কৃত দুইটি শিলালেখ বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসে যথেষ্ট আলোকপাত করে। চেদীরাজ কর্ণ এবং সেন নৃপতি বিজয়সেনের নামাঙ্কিত দুইটি পৃথক স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিসমূহ পাঠে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে জানা যায়। কলচুরী রাজগণের প্রশস্তিসমূহ এবং (অতীশ) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের তিব্বতী ভাষায় লিখিত জীবন-কাহিনী হইতে প্রাচ্যদেশে অর্থাৎ গৌড়বঙ্গে চেদীরাজগণের আধিপত্য বিস্তারের কাহিনী সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। পালরাজা নয়পালের রাজত্বকালে চেদীরাজ লক্ষ্মীকর্ণ বা কর্ণদেব মগধ আক্রমণপূর্বক তথাকার বহু বৌদ্ধ বিহারসমূহ ধ্বংস করেন তাহা তিব্বতী কাহিনীতে লিপিবদ্ধ আছে। নয়পালের রাজত্বকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ডঃ বিনয়চন্দ্র সেনের মতে তাঁহার রাজত্বকাল আনুমানিক ১০৩২-১০৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ (*'Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal' by B. C. Sen* পুস্তকের *p-XLVIII* দ্রষ্টব্য)। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে নয়পালের রাজত্বকাল আনুমানিক ১০৩৮-১০৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ (পৃঃ ৬৫ ; 'বাংলাদেশের ইতিহাস' প্রথমখণ্ড—প্রাচীন যুগ—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক উপরোক্ত কাহিনী হইতে জানা যায় প্রধানতঃ (অতীশ) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ঘটে এবং চেদীরাজ ও পাল নৃপতিগণের মধ্যে সন্ধি-চুক্তি হয়। কিন্তু এই সন্ধি-চুক্তি বেশীদিন কার্যকরী হয় নাই। সম্ভবতঃ পাল সম্রাট নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে চেদীরাজ কর্ণ পুনরায় গৌড়দেশ আক্রমণ করেন। তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধেও মতভেদ লক্ষিত হয়। ডঃ বিনয়চন্দ্র সেনের মতে তাঁহার রাজত্বকাল আনুমানিক ১০৪৭-১০৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ (ডঃ সেন প্রণীত উপরোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় অবশ্য অনুমান করেন তৃতীয় বিগ্রহপাল আনুমানিক ১০৫৪-১০৭২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেন (ডঃ মজুমদার প্রণীত উপরোক্ত গ্রন্থের

৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পাইকোড়ে আবিষ্কৃত স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে স্বয়ং কর্ণদেব কর্তৃক এক দেবীমূর্তি উৎসর্গের কথা জানা যায় এবং উত্তর রাঢ়ে চেদী আধিপত্য বিস্তারের কাহিনী এই শিলালিপি দ্বারা সমর্থিত হয়। পাইকোড় উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সন্নিকটে অবস্থিত 'নারায়ণ-চত্বর' নামে পুষ্করিণীতীরে এক উন্মুক্ত বেদীর উপর অন্যান্য ভগ্ন শিলামূর্তিসহ এই শিলাস্তম্ভটি অরক্ষিত অবস্থায় আছে। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার তৎকালীন অস্থায়ী মহাধিকর্তা ডঃ ডি. বি. স্পুনার এই শিলালিপিটির পাঠোদ্ধার পূর্বক *Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1921-22* গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। শিলালিপিটি বর্তমানে খুবই অস্পষ্ট। ছয় লাইনের লিপিটি ব্যস্ততার মধ্যে অগভীরভাবে উৎকীর্ণ হয় অনুমান। আনুমানিক একাদশ শতাব্দীতে উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রচলিত বঙ্কিম লিপিদ্বারা শব্দগুলি উৎকীর্ণ। লেখটি এই :—

১ম পংক্তি ··· শ্রীশ্রীগণপতি
২য় „ ··· × × ×
৩য় „ ··· ওঁ দেব-দ্বিজ গুরু [ভজঃ] স্তরি···
দ্বয় ভক্তিনান্ত
৪র্থ „ ··· নেহয়ন ··· [শ্রদ্ধ] যা-স্মিন কর্ম্মণি রাজশ্রী কর্ণদেব
৫ম „ ··· ওঁ স্বস্তি সমৃদ্ধ রাজ্য-শ্রী-চেদীর (আজ্য) শ্রীকর্ণদেব
[স্য] জ্য নন্তরা কীর্ত্তি প্রশাস্তি (?)।
৬ষ্ঠ „ ··· শ্রীবিশ্বকর্মা চরণ-প্রসাদাৎ
দেবী-মূর্ত্তি নৃমিত প্তীয় শ্রী কান্তি···

অর্থাৎ চেদীরাজ কর্ণদেবের আদেশে কোন ভাস্কর এক দেবীমূর্তি নির্মাণ করেন। চেদীরাজ কর্ণদেবের দ্বিতীয়বারের বঙ্গাভিযান তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে অনুকূল না হইলেও পালরাজা তৃতীয় বিগ্রহপালের সহিত তিনি আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হন। সন্ধ্যাকরনন্দী রচিত 'রামচরিত' কাব্য হইতে জানা যায় যে কর্ণদেবের কন্যা যৌবনশ্রীর সহিত তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের বিবাহ হয়। পাইকোড়ের কয়েক মাইল পূর্বে অবস্থিত মিত্রপুর গ্রামই সম্ভবতঃ এই আত্মীয়তার স্মৃতি বহন করিতেছে ; স্থানীয় জনশ্রুতি বর্তমান।

কর্ণদেবের নামাঙ্কিত শিলাস্তম্ভটি বর্তমানে ভগ্ন, কোন দেবী মূর্তি দেখা যায় না। এই স্তম্ভটি সম্ভবতঃ ভূমিমধ্যে প্রোথিত ছিল। নিম্নে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও পত্রলতায় পরিপূর্ণ মঙ্গলঘট এবং মধ্যস্থলে কীর্তিমুখ

উৎকীর্ণ আছে। এই শিলাস্তম্ভের ভাস্কর্য সুন্দরভাবে রূপায়িত এবং সত্যই বাঙ্গালাদেশের শিল্পীর তক্ষণ-শিল্প প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। অন্য শিলালিপিটিতে এই কয়টি শব্দ উৎকীর্ণ আছে—"রাজেন শ্রী বিজয় সে"...। বিজয়সেনের নামাঙ্কিত স্তম্ভটির উপরিভাগে এক মুণ্ডহীন মনসাদেবীর মূর্তি ক্ষোদিত আছে। এই শিলালিপিদ্বারা বিজয়সেনের রাঢ় অঞ্চলে আধিপত্য প্রমাণিত হয়।

'নারায়ণচত্বর' পুষ্করিণীতীরে অবস্থিত উন্মুক্ত বেদীর উপর আরও কয়েকটি ভগ্ন শিলামূর্তি আছে। বিষ্ণু, উমা-মহেশ্বর, অষ্টভুজা দেবীমূর্তি ইত্যাদি এই স্থানে আছে। এই দেবীর নিকট একটি নরসিংহ মূর্তি দেখা যায়। ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার উপরোক্ত বাৎসরিক রিপোর্টের ৮০-৮১ পৃষ্ঠায় এই মূর্তির বর্ণনা আছে এবং ইহার একটি আলোকচিত্র (*PLATE XXVIII D*) ঐ গ্রন্থে সংযোজিত আছে। নরসিংহ অবতারের স্তম্ভ হইতে আবির্ভাবের দৃশ্যটি মূল মূর্তিটির বামপার্শ্বে ক্ষোদিত আছে। স্তম্ভগাত্রে অসুর হিরণ্যকশিপুকে পদাঘাত করিতে দেখা যায়। দক্ষিণপার্শ্বে উৎকীর্ণ ভগ্ন মূর্তিদ্বয় সম্ভবতঃ হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদের মূর্তি রূপে অনুমিত হয়। প্রধান নরসিংহ-মূর্তিটি পদতলে শায়িত এক মূর্তিকে বামপদ দ্বারা পদাঘাত করিতে এবং দুই নিম্ন হস্ত দ্বারা ক্রোড়ে শায়িত অসুরের পেট বিদীর্ণ করিয়া অন্ত্রনালীসমূহ বাহির করিতে দেখা যায়। মূর্তিটির উপরের দুই হস্ত বর্তমানে ভগ্ন। সিংহের কেশর মুখমণ্ডলের দুইপার্শ্বে বৃত্তাকারে ন্যস্ত। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শিল্প-শৈলী অনুসরণে নির্মিত এই মূর্তিটি সমকালীন প্রচলিত অলঙ্কারের দ্বারা সজ্জিত। পাদপীঠে সম্ভবতঃ মূর্তিদাতা ও তাঁর স্ত্রীর প্রতিমূর্তি অঙ্কিত।

গ্রামস্থ 'বুড়োশিবের মন্দির'মধ্যে বর্তমানে অনেকগুলি প্রস্তর মূর্তি পূজিত হইতেছে। সিন্দুর লেপনে এবং বহুদিন যাবৎ পূজা-অর্চনার ফলে মূর্তিগুলির সঠিক পরিচয় পাওয়া কষ্টসাধ্য। এইস্থানেও কয়েকটি মূর্তিগাত্রে লিপি উৎকীর্ণ থাকিবার কথা পূর্ব বিবরণী মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। এই-স্থানে সপ্তাশ্ববিহীন দণ্ডায়মান সূর্যের এক প্রস্তর মূর্তি পূজিত হইতেছে। মূর্তির পাদপীঠে শুধুমাত্র পদ্মপুষ্প ক্ষোদিত আছে, পার্শ্বে পিঙ্গল ও দণ্ডের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। মূর্তিটি এইস্থানে 'চতুর্ভুজা' রূপে পরিচিত। অন্য মূর্তিগুলির সঠিক পরিচয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত হইয়াছে। হরিহর দেবতার এক সমন্বয়ী মূর্তি এই ভাস্কর্যের মাধ্যমে প্রতিভাত, ডঃ স্পুনারের তাই মত (*Arch. Survey Report 1921-'22*এর ৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

পাইকোড় গ্রামের বিভিন্ন অংশে মুসলমান পীরদের আস্তানার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখান হইতে কয়েক মাইল পূর্বে অবস্থিত ননগড় গ্রামের এক মসজিদে আরবী ভাষায় শিলালিপি ক্ষোদিত থাকিবার সংবাদ পাওয়া যায়।

পাইকোড়ের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত হিয়াৎনগর গ্রামে প্রাচীন দুর্গের অবস্থিতি সম্বন্ধে তথ্যাদি পাওয়া যায়। পাইকোড়ের দক্ষিণে বিলাসপুর গ্রাম সম্ভবতঃ পাল সম্রাট প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসনে উল্লিখিত 'বিলাসপুর-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার'রূপে অভিহিত বিলাসপুরের স্মৃতি বহন করিতেছে নগেন্দ্রনাথ বসু তাহা অনুমান করেন। এই গ্রামের রাণীদীঘির দক্ষিণে অবস্থিত একটি ধ্বংসস্তূপকে গ্রামবাসীগণ 'রাজবাড়ী'-রূপে চিহ্নিত করেন। নিকটবর্তী তীরগ্রামে কয়েকটি ভগ্নমূর্তি প্রাপ্তির সংবাদ পাওয়া যায়।

পাইকোড়ে 'বাণব্রত' উৎসবের উল্লেখ পূর্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই উৎসবে প্রচলিত মন্ত্র ও পাঁচালীর মধ্যে অনেক সাঁওতালী শব্দ, পরস্পর বিরোধী ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাব ও সহাবস্থান রাঢ়ের এই অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্কৃতিধারার সমন্বয়তার কাহিনী ব্যক্ত করে।

পাইগোড়া-পুড়গুণ্ডা-মহেশপুর ঃ খয়রাশোল থানার অন্তর্গত এই গ্রামগুলি পাঁচড়া রেলষ্টেশন হইতে প্রায় ১ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। পুড়গুণ্ডা গ্রামে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভগুলি পড়িয়া আছে। ভগ্ন দেওয়ালের স্থানে স্থানে প্রস্তরের আবরণ দেওয়া আছে। ছাদের গম্বুজগুলির সবই প্রায় ভগ্ন। জনশ্রুতি আছে রাজনগর পাঠান জায়গীরদারদের দখলে আসিলে জনৈক পাঠান রাজা এই গ্রামে প্রাসাদ নির্মাণ পূর্বক বাস করিতেন। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া মাকড়াপ্রস্তরখণ্ডসমূহ বিক্ষিপ্ত আছে দেখা যায়। এক মুসলমান ফকীর শরণ সাহেবের সমাধি এইস্থানে আছে জানা যায়। ধ্বংসাবশেষের নিকট এক বিরাট দীঘি আছে। দীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ভিত্তিপ্রস্তরগুলির বিন্যাস দেখা যায়।

পাঁচড়া ঃ খয়রাশোল থানার অন্তর্গত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম এবং অণ্ডাল-সাঁইথিয়া রেলপথে অবস্থিত একটি রেলষ্টেশন। এই গ্রামে বেশ কয়েকটি মন্দির আছে। 'নূতনপাড়ায়' ১৭৯৫ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত এক চার-চালা রীতির শিবমন্দির আছে। গ্রামমধ্যে ইষ্টকনির্মিত আরও চার-চালা রীতির মন্দির আছে তবে ঐগুলির মধ্যে কোন অলঙ্করণ নাই।

গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে 'ভৈরবথানে'র নিকট এক প্রস্তরনির্মিত 'রেখ দেউল' আছে। এই মন্দিরটির সহিত (মূলমন্দির) কবিলাসপুরে অবস্থিত 'রেখ দেউলে'র স্থাপত্য-শৈলীর যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তবে পাঁচড়ার মন্দিরের সম্মুখে 'এক-বাংলা' রীতির মণ্ডপ সংযুক্ত হইয়া স্থাপত্যের অভিনবত্বের জন্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার কর্তৃক এই মন্দিরটি সংরক্ষিত হইয়া সংস্কারের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

গ্রামের মধ্যে আর একটি প্রস্তরনির্মিত বিষ্ণু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া এইটি কোন্ স্থাপত্য-শৈলী অনুসরণে নির্মিত হইয়াছিল বলা মুস্কিল। মন্দিরের উপরিভাগ সমস্ত ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। মন্দির সম্মুখে দালানের দুইটি পলকাটা স্তম্ভ এখনও দণ্ডায়মান। মন্দিরগাত্রে প্রস্তরের উপর কৃষ্ণলীলার ঘটনাবলী, অনন্তশায়ী বিষ্ণু, অবতারগণ, ইন্দ্র, ব্রহ্মা এবং যোদ্ধগণের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরগাত্রে প্রস্তরের উপর এই সমস্ত দৃশ্যাবলীর মাধ্যমে অলঙ্করণ চিত্তাকর্ষক।

পাথরকুচি : খয়রাশোল থানার অন্তর্গত কর্মকার অধ্যুষিত এই গ্রাম পাঁচড়া যাইবার প্রবেশপথে অবস্থিত। গ্রামের মধ্যে ১৬০৪ শকাব্দে জনৈক শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠিত এক প্রস্তরনির্মিত চার-চালা মন্দির আছে। মন্দিরের দ্বারোপার্শ্বে অবতারগণ, গণেশ ইত্যাদির প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। স্থূল শিল্প-শৈলী এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে প্রতিফলিত।

পাথরচাপুড়ী : সিউড়ী থানার পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত এই গ্রামের 'দাতা সাহেবে'র অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনী সর্বজনবিদিত। কথিত হয় যে ইনি সিপাহী বিদ্রোহের পলাতক সৈন্য। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সাধনের জন্য দাতা সাহেব চেষ্টা করেন। তাঁহার সমাধিভূমি আজও হিন্দু-মুসলমানের শ্রদ্ধার ক্ষেত্র। দাতা সাহেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে এই গ্রামে মহাসমারোহে মেলা বসে। এখানের দরগাটি দর্শনীয়।

পারশুণ্ডী : খয়রাশোল থানার অন্তর্গত এই গ্রাম রসা হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে অজয় নদীতীরে অবস্থিত। এই গ্রামে ৩টি প্রস্তরনির্মিত শিবমন্দির এবং আরও ৭টি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। রসায় অবস্থিত মন্দিরগুলি অপেক্ষা এই স্থানের মন্দিরগুলির আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। সম্ভবতঃ রসার মন্দিরের ন্যায় এইগুলি একই ধরণের স্থাপত্য-শৈলী অনুসরণে নির্মিত। ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রোথিত

ক্ষোদিত প্রস্তরখণ্ডসমূহ হইতে (কৌণিক পত্রাকৃতি খিলান ও পদ্মপুষ্প, পত্রাবল্লী এবং স্তম্ভার্ধ ইত্যাদি) এবং মধ্যে গম্বুজের অবস্থান হেতু এই ধারণা হয় যে এখানের মন্দিরগুলিও রসার মন্দিরের সমসাময়িক।

এইস্থানে ভগ্ন বুদ্ধমূর্তি (?) এবং মুঘলযুগের মুদ্রা আবিষ্কারের কাহিনী শুনা যায়।

পেরুয়া : খয়রাশোল থানার অন্তর্গত এবং নিকটবর্তী পাঁচড়া রেল-ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল উত্তরে এই গ্রাম অবস্থিত। সিউড়ী-লোকপুর-গামী যে কোন বাসে আরোহণ করিয়া পেরুয়া-গোপালপুর মোড়ে আসিতে হইবে। বাসরাস্তা হইতে ১ মাইল গ্রাম্যপথে আসিলে গ্রামে পৌঁছান যায়।

গ্রামে 'রাধাবিনোদ মন্দির' নামে এক পুরাতন মন্দির আছে। জনশ্রুতি আছে যে রাজনগরের জনৈক ফৌজদারের একবার কঠিন চর্ম-রোগ হইলে পেরুয়ার দাশগুপ্ত বংশীয় তদানীন্তন প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺রাধিকাচরণ দাশগুপ্ত মহাশয় প্রদত্ত ঔষধাদিতে ঐ ফৌজদার আরোগ্য-লাভ করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ঐ কবিরাজ মহাশয়ের কুলদেবতা রাধা-বিনোদের মন্দির আনুমানিক ১১৬১ বঙ্গাব্দে ঐ মুসলমান ফৌজদার নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

মন্দিরটি ত্রিতল, সমতলছাদযুক্ত তুইতল হর্মরাজির উপর ক্ষুদ্র 'এক-বাংলা' রীতির (দো-চালা) ক্ষুদ্র দীপাগার। মন্দিরটির আনুমানিক উচ্চতা প্রায় ৪০ ফিট হইবে। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পূর্ব ও দক্ষিণদিকে তুইটি দরজা আছে। এই ধরণের স্থাপত্য-শৈলী এই গ্রামের প্রস্তরনির্মিত মুরলীধর মন্দির ও পার্শ্ববর্তী গোপালপুর গ্রামের তুইটি মন্দিরে অনুসৃত হইয়াছে। রাধাবিনোদ মন্দিরের পূর্বদ্বারের খিলানের উপরিভাগে প্রস্ফুটিত পদ্ম এবং লম্ফনোদ্যত সিংহের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। উত্তরদিকের দ্বারের উপরিভাগ ফুল-লতা-পাতার অলঙ্করণের দ্বারা সজ্জিত।

বক্রেশ্বর : তুবরাজপুর থানার অন্তর্গত এবং তুবরাজপুর রেলষ্টেশন হইতে প্রায় ৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বক্রেশ্বর বীরভূম জেলার এক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র ও পর্যটকগণের উপভোগ্য স্থান। এখানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও মনোরম। এই তীর্থক্ষেত্রের পূর্ব ও উত্তরদিকে বক্রেশ্বর নদী ধীরগতিতে প্রবাহিত হইতেছে ; দক্ষিণাংশে পাপহরা নদী। মন্দিরের দক্ষিণদিকে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কয়েকটি উষ্ণজলের প্রস্রবণ, বর্তমানে কুণ্ডের আকার ধারণ করিয়া আছে। যোগকুণ্ড এবং বক্রেশ্বরদেবের

উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত অন্যান্য বহুসংখ্যক শিবমন্দির মূল বক্রনাথের মন্দিরের চতুর্দিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত। সাম্প্রতিককালে জরাজীর্ণ হইয়া অনেক মন্দির ধূলিসাৎ হইবার পর 'বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাষ্ট' কর্তৃক চতুষ্পার্শ্বের এই সমস্ত মন্দিরের সংস্কার কার্য সাধিত হয়। এখন ঐগুলি গোলাপী রঙের প্রলেপ মণ্ডিত হইয়া নবরূপ ধারণ করিয়াছে। পূর্বে এখানের শ্বেতগঙ্গা কুণ্ডের উত্তর-পূর্ব কোণে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের চারিদিকে কতিপয় ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিবার কাহিনী লোকমুখে শুনা যায়, কিন্তু অধিকাংশ মূর্তিই বর্তমানে অপহৃত বা অপসারিত হইয়াছে।

'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে'র মধ্যে পরিবেশিত 'স্বয়ম্ভু সংবাদে' গৌড়দেশে 'বক্রেশ্বর' নামে অভিহিত পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের উল্লেখ আছে ('বক্রেশ্বর মাহাত্ম্যম্'-প্রথমোঽধ্যায়) এবং এই প্রসঙ্গে উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে। অষ্টাবক্রমুনির সিদ্ধিলাভের স্থানরূপে প্রসিদ্ধিলাভের পর 'সিদ্ধপীঠ'রূপে বক্রেশ্বর খ্যাতি লাভ করে। বিশ্বকর্মা দ্বারা এখানের মন্দির নির্মিত হয় জনশ্রুতি আছে। মন্দিরের মধ্যে বিরাজিত বৃহত্তর লিঙ্গমূর্তিটি অষ্টাবক্রের ও ক্ষুদ্রটি বক্রনাথের। বর্তমান মূলমন্দিরটি ওড়িশার স্থাপত্য-শৈলী অনুসারে নির্মিত রেখ-দেউল। মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে যে প্রস্তরফলক ক্ষোদিত আছে তাহা পাঠ করিলে জানা যায় যে এই অংশটি বীরভূমাধিপতি রাজা আসদ্‌জমান খাঁয়ের দর্পনারায়ণ নামক জনৈক মন্ত্রীর দ্বারা ১৬৮৫ সালিবাহনে (১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) নির্মিত হয়।

বক্রেশ্বরের অষ্টকুণ্ডের উৎপত্তি এবং ঐগুলি সম্বন্ধে তথ্যাদি 'বীরভূম-বিবরণ'-১ম খণ্ডের 'বক্রেশ্বর-কাহিনী' শীর্ষক অধ্যায়ের ১৬২ পৃষ্ঠা হইতে ১৬৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

বক্রেশ্বরে সতীর ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ 'মনঃ' (ভ্রূমধ্যস্থ স্থান) পতিত হওয়ার জন্য বক্রেশ্বর শাক্তপীঠরূপেও গণ্য। বর্তমানে এখানের এক মন্দিরে অষ্টধাতুনির্মিত মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি পূজিতা হইতেছেন। এখানের ভৈরবের নামও 'বক্রনাথ' (শিবচরিতের মতে 'বক্রেশ্বর') এবং এই কারণে স্থানটির নামও 'বক্রেশ্বর' হইয়াছে। 'পীঠনির্ণয় তন্ত্রে' উল্লেখ আছে :—

"বক্রেশ্বরে মনঃপাতো বক্রনাথস্তু ভৈরবঃ। (পাঠান্তরে 'মুণ্ডপাতং')
নদী পাপহরা তত্র দেবী মহিষমর্দিনী ॥" ৫০

'শিবচরিতের' মতে বক্রেশ্বরে সতীর 'দক্ষিণবাহু' পতিত হয় এবং এই কারণে এইস্থান 'মহাপীঠ'রূপে গণ্য। এখানের দেবীর নাম 'বক্রেশ্বরী' ও ভৈরবের নাম 'বক্রেশ্বর' উল্লেখ আছে। 'শিবচরিতে' 'বক্রনাথ' নামে

এক মহাপীঠে সতীর 'মনস্' পতিত হইবার কাহিনী ও তথায় দেবীর নাম 'পাপহরা' ও ভৈরবের 'বক্রনাথ' নামে উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ একই মহাপীঠের 'বক্রনাথ' এবং 'বক্রেশ্বর' নামে দ্বিরুক্তি 'শিবচরিতে'র মধ্যে পাওয়া যায়।

বক্রেশ্বর পীঠক্ষেত্রের অদূরবর্তী (ডিহিবক্রেশ্বর গ্রামে) পাণ্ডাদিগের আবাসবাটির সমীপস্থ একটি পুষ্করিণীগর্ভে অষ্টাদশভুজা মহিষমর্দিনীমূর্তি আবিষ্কারের কাহিনী লোকমুখে প্রচলিত, ঐস্থানে দেবীর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল ধারণা হয়।

সম্প্রতি পর্যটকগণকে আকর্ষণের জন্য বক্রেশ্বরের উন্নতি সাধনকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক এক প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। এখানের স্নানের জন্য ঘাট ইত্যাদি সংস্কারসাধন করিয়া বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সজ্জিত করা হইয়াছে। নিকটে অবস্থানের জন্য পূর্ত (সড়ক) বিভাগের এক পরিদর্শন বাংলো আছে।

বারাঃ নলহাটী থানার অন্তর্গত এবং লোহাপুর ষ্টেশনের প্রায় দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত বারা মুসলমান প্রধান গ্রাম। লোহাপুর ষ্টেশনের উত্তর হইতে ক্রমান্বয়ে বারা, কুমারষাণ্ডা, নগরা, সাহাকর, বাণেশ্বর প্রভৃতি গ্রাম লইয়া বারার পূর্বতন সীমা বিস্তৃত ছিল। বারা, নগরা ও বাণেশ্বর এই তিন গ্রাম একত্রে পূর্বে 'বারণাবত' নগর নামে অভিহিত হইত জনশ্রুতি আছে। বাণরাজার রাজধানী রূপেও অনেকে এই স্থানকে চিহ্নিত করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে বালা-রাজার রাজধানী হইতে বালানগর পরবর্তীকালে 'বারা'তে রূপান্তরিত হয়। কিংবদন্তী আছে কয়েকশত বৎসর পূর্বে এইস্থানে বীরেন্দ্রনাথ রায় নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। ব্রহ্মশাপের ফলে তাঁহার রাজ্য এক রাক্ষস কর্তৃক আক্রান্ত হইলে রাজা এই রাক্ষসের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়া সন্ধি করেন যে "রাক্ষস আপন আহার্য স্বরূপ বারার প্রতি গৃহস্থবাড়ী হইতে নিত্য একটি করিয়া মনুষ্য নিয়মিতভাবে পাইবে।" এই ব্যবস্থা চলিতেছিল, এমন সময় আনুমানিক ৮৯২ হিজরীতে অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সমরকন্দ সহর হইতে খোন্দকার লোহাজঙ্গ সাহেব এই নগরে পদার্পণ করিয়া রাক্ষসটিকে বিনষ্ট করেন। তাঁহার এই অলৌকিক কাহিনীতে মুগ্ধ হইয়া রাজা সপরিবারে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। নগরবাসীদের মধ্যে অনেকেই রাজার পথ অনুসরণ করেন। এইভাবে বালা-নগরের নাম 'কসবায়ে বালা-নগর' নামে অভিহিত হয়। গ্রামে প্রবেশ করিলে লোহাজঙ্গ সাহেবের সমাধি দেখা যায়। সমাধিপার্শ্বে

প্রস্তর নির্মিত চৌকাঠের অংশসমূহ পড়িয়া আছে। এই স্থানে আরবী ভাষায় 'নস্‌খ' লিপিতে উৎকীর্ণ এক শিলালিপি রক্ষিত আছে। সামসুদ্দীন আহমেদ সম্পাদিত '*Inscriptions of Bengal, Volume IV,' Rajsahi, 1960* গ্রন্থের ৭০-৭১ পৃষ্ঠায় এই শিলালিপির উল্লেখ আছে। ৮৬৪ হিজরীতে অর্থাৎ ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে বারবক শাহ-এর রাজত্বকালে জনৈক উলুঘ অজেলক খান (?) কর্তৃক এক মসজিদ নির্মাণের বিবরণী এই শিলালিপিতে আছে। মসজিদটি ইমাম মৌলানা ওরফে 'কাদীর' জন্য বারবক শাহের রাজত্বের প্রথম বৎসরের প্রারম্ভে নির্মিত হয়। এই লিপিতে ঢাকা নগরীর (সম্ভবতঃ বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা নগরের) উল্লেখ আছে। আহমদ হাসান দানী কর্তৃক লিপিবদ্ধ *"Bibliography of Muslim Inscriptions in Bengal"*-এর ২২ পৃষ্ঠায় ৩০ নং তালিকায় এই শিলা-লিপির উল্লেখ আছে (*Journal of the Asiatic Society of Pakistan, Vol II, 1957* পত্রিকার পরিশিষ্ট রূপে সংযোজিত)। *Epigraphia Indica—Arabic and Persian Supplement, 1953-'54, pp.21-22*তে এই শিলালিপি সম্বন্ধে আলোচনা আছে এবং *Plate VIII(a)*তে শিলালিপিটির এক আলোকচিত্র আছে।

১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বোগদাদ সহর হইতে সৈয়দ শাহ গোলাম আলী দাস্তগীর কাদেরী নামে এক সাধু বারায় আগমন করেন। তাঁহার দৌহিত্র বংশীয়েরা বর্তমানে এইখানে আছেন। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বহু মুসলমান ইঁহাদের শিষ্য। ইঁহাদের বাড়ীতে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তক হজরত মহম্মদের পদ-চিহ্নযুক্ত একখণ্ড প্রস্তর 'কদম-রসুল' নামে চিহ্নিত হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জনসাধারণের নিকট ভক্তিভরে এইটি প্রদর্শিত হয়। গ্রামে মোখতুম হোসেনী সাহেবের সমাধির নিকট ব্যাসাল্ট প্রস্তরে নির্মিত চৌকাঠের সুবৃহৎ অংশসমূহ পড়িয়া আছে। কারুকার্য দেখিয়া কোন মসজিদের অংশবিশেষ মনে হয়। পার্শ্বে একটি শিলাপট আরবী ভাষায় সুন্দর 'নস্‌খ' লিপি দ্বারা উৎকীর্ণ দেখা যায়। সামসুদ্দীন আহমেদ সম্পাদিত উপরোক্ত গ্রন্থের ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠায় এই শিলালিপিটি সম্বন্ধে বিবরণী আছে। *Annual Report on Indian Epigraphy 1959-'60, Appendix D No. 2*এর মধ্যে এই শিলালিপি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। বারাগ্রামের শাহ মখতুম হুসৈনীর সমাধিগাত্রে এই শিলাটি প্রোথিত ছিল। বর্তমানে এ সমাধির জীর্ণ অবস্থা, এখন শিলাপট্টটি উন্মুক্ত আকাশতলে রহিয়াছে। এই

শিলালিপির মাধ্যমে জানা যায় যে ৮৫৪ হিজরীতে (১৮ই আগষ্ট ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে) নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে জনৈক উলুঘ আহমেদ খান দ্বারা এক মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল। এই সমস্ত শিলালিপি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বাঙ্গালাদেশে মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভে বারা খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। সামসুদ্দীন আহমেদ সম্পাদিত উপরোক্ত গ্রন্থে উপরে বর্ণিত শিলালিপিদ্বয়ের আলোকচিত্র আছে।

এই সমস্ত মুসলমানযুগের ঐতিহাসিক উপাদান ছাড়া বারার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই গ্রামে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মূর্তির অবস্থিতি সম্বন্ধে 'বীরভূম-বিবরণ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে। বিনয় ঘোষ রচিত 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' শীর্ষক গ্রন্থের 'বারাগ্রাম' অধ্যায়ে এই গ্রামে প্রাপ্ত মূর্তি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। এছাড়া ১৯২০-২১ সালের ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার (পূর্বচক্রের) বাৎসরিক রিপোর্টের ২৭ পৃষ্ঠায় বারার মূর্তি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। অত্যন্ত পরিতাপের কথা উপরোক্ত গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত প্রায় সমস্ত মূর্তিগুলিই আজ অন্তর্হিত বা অপহৃত। গ্রামের মধ্যে মালাকার পরিবারের একটি কুটিরের সম্মুখে উন্মুক্ত দালানে সম্ভবতঃ বিষ্ণু-লোকেশ্বর মূর্তির এক ভগ্ন প্রভামণ্ডল অরক্ষিত অবস্থায় আছে। বামপার্শ্বে বীণা বাদনরতা দণ্ডায়মানা সরস্বতীর সহিত পদ্মহস্তে লীলায়িত ভঙ্গিমায় লোকেশ্বরের উপস্থিতি আমাদের অনুমানকে সমর্থন করে।

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহে এক চতুরাননা অষ্টভুজা দেবী মূর্তির উল্লেখ আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে এ মূর্তিটি স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় কলিকাতায় আনিয়া রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহ-শালায় প্রদত্ত হইয়া তথাকার শোভা বর্ধন করিতেছে। 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থে এই দেবীর যে পরিচিতি আছে তাহা সঠিক নয়। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য প্রণীত 'বৌদ্ধদের দেবদেবী' শীর্ষক পুস্তকে প্রদত্ত 'নিস্পন্নযোগাবলী' হইতে সংগৃহীত বৌদ্ধ বজ্রতারার সমস্ত পরিবার-দেবতা বা আবরণ দেবতাসহ পূর্ণ মণ্ডলের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে (পৃঃ ৭৮-৭৯)। এই বিবরণ পাঠে ধারণা হয় এই দেবী বৌদ্ধ বজ্রতারা দেবীরূপে পরিগণিত হইতে পারেন। বজ্রতারা রত্নসম্ভব-কুলের দেবী। আমাদের আলোচ্য বজ্রতারা দেবীর মস্তকের উপর বরদমুদ্রাধারী রত্নসম্ভবের একটি ক্ষুদ্র মূর্তি ক্ষোদিত আছে দেখা যায়। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন 'বজ্রতারার মূর্তি নানা রকমের পাওয়া যায়। তাঁহার মূর্তির বাহুল্য দেখিয়া মনে হয় বজ্রতারা

শক্তিশালী দেবী ছিলেন, এবং তাঁহার মূর্তি, মন্ত্র, উপাসনাদি সমাজের নানা কাজে ব্যবহৃত হইত। তাই তান্ত্রিকদিগের ভিতর তিনি জনপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। বজ্রতারার শরীরের বর্ণ পীত এবং তিনি বজ্রপর্যাঙ্কাসনে ধ্যানমগ্ন থাকেন। দেবী রূপলাবণ্যবতী, নবযৌবনোদ্ভিন্না, এবং সর্বালঙ্কারভূষিতা। তিনি চতুর্মুখা ও অষ্টভুজা এবং দশদেবী পরিবৃতা। তাঁহার মন্ত্র "ওঁ তারে তুত্তারে তুরে স্বাহা" দশাক্ষর। দশ অক্ষরের প্রত্যেকটি অক্ষর হইতে এক একটি দেবীর উৎপত্তি হয়। বজ্রতারা চারিটি দক্ষিণভুজে বজ্র, পাশ, শঙ্খ, ও শর ধারণ করেন এবং চারিটি বামভুজে বজ্রাঙ্কিত অঙ্কুশ, উৎপল, ধনু এবং তর্জনী প্রদর্শন করিয়া থাকেন। দেবীর চতুর্দিকে চারিটি দ্বারে চারিজন দ্বারদেবী থাকেন। পূর্বদ্বারে বজ্রাঙ্কুশী, দক্ষিণ দ্বারে বজ্রপাশী, পশ্চিম দ্বারে বজ্রস্ফোটী এবং উত্তর দ্বারে বজ্রঘণ্টা অবস্থান করেন।" ঊর্ধ্বে উষ্ণীষবিজয়া এবং নিম্নে সুম্ভার অবস্থিতি সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায়। বারা হইতে সংগৃহীত উপরোক্ত মূর্তিতে সম্ভবতঃ এই ছয়টি দ্বারদেবীর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। দ্বারদেবীগণের বর্ণনা উপরোক্ত গ্রন্থের ৯০-৯১ পৃষ্ঠায় আছে।

বারার পার্শ্ববর্তী যথা কুমারষাণ্ডা, বাণেশ্বর, নগরা, সাহাকরদীঘি, তিলোড়া, প্রভৃতি গ্রামসমূহে ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি ইত্যাদির অবস্থিতির উল্লেখ পুরাতন গ্রন্থাদিতে আছে। বারা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শিল্প-শৈলী অনুসরণে নির্মিত প্রস্তর মূর্তিগুলির আলোকচিত্র নিরীক্ষণপূর্বক ধারণা হয় যে এই অঞ্চলে এইসময় বজ্রযানী বৌদ্ধদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মেরও প্রভাব ও প্রতিপত্তি কম ছিল না। গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভগ্ন মৃৎপাত্রের অংশসমূহ চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত। প্রাচীন সাংস্কৃতিক নিদর্শনগুলির বিচার ও সময় নিরূপণের জন্য এইগুলি অবলম্বনে ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন বিশেষ-ভাবে অনুভূত হয়। হলকর্ষণের সময় বা গ্রামের সেচ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে খাল-খননের সময় মৃত্তিকা মধ্য হইতে অনেক প্রাচীন নিদর্শন এখনও বাহির হয় শুনা যায়। গ্রামটির পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা এবং সম্ভব হইলে খননকার্য পরিচালিত হইলে আরও নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

বারুইপুরঃ ইলামবাজার থানার অন্তর্গত এবং ইলামবাজারের কিছু উত্তরে এই গ্রামে লাউসেন পূজিত সিদ্ধেশ্বর ধর্মঠাকুর অধিষ্ঠিত আছেন। এইখানে লাউসেন রাজার গড ছিল বলিয়া জনশ্রুতি আছে।

বালিগুনী : নানুর থানার অন্তর্গত এই গ্রাম নানুরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। পূর্বে এই গ্রামের পার্শ্ব দিয়া অজয় নদ প্রবাহিত হইত কথিত হয়। গ্রামমধ্যে পশ্চিমপাড়ায় তুইটি আট-চালা শিবমন্দির আছে। দক্ষিণদুয়ারী এই মন্দির তুইটি জীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। মন্দিরের প্রবেশ পথের খিলানের উপর নিবদ্ধ মৃৎফলকে অলঙ্করণ আছে। দক্ষিণ পার্শ্বের মন্দিরটিতে রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য উৎকীর্ণ। অপর মন্দিরটিতে গরুড়বাহনোপরি বিষ্ণুর সহিত বৃষারূঢ় পঞ্চানন শিবের সহিত সঙ্ঘর্ষের দৃশ্য ক্ষোদিত আছে। স্থাপত্য-শৈলী দেখিয়া অনুমিত হয় যে মন্দির তুইটি অষ্টাদশ শতকে নির্মিত হইয়াছে।

বীরচন্দ্রপুর : ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত এবং সাহেবগঞ্জ লুপলাইনে মল্লারপুর ষ্টেশনের প্রায় ৮ মাইল পূর্বে অবস্থিত এই গ্রাম ও তাহার পার্শ্ববর্তী 'গর্ভবাসরূপে' পরিচিত অঞ্চল বৈষ্ণবগণের পবিত্র তীর্থভূমি। 'গর্ভবাসে' মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্মভূমি আর পার্শ্ববর্তী গ্রাম 'ভদ্রপুর' বা 'ভদ্দপুর' গ্রামে নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র বা বীরচন্দ্র গোস্বামীর জন্মস্থান। সম্ভবতঃ তাঁহার নামানুসারে এই গ্রামের নামকরণ বীরচন্দ্রপুর হয়। পূর্বে এই অঞ্চল 'একচক্রা' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। জনশ্রুতি আছে যে 'একচক্রা'র সীমা ময়ূরাক্ষী নদীর উত্তরতীর হইতে রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত তেঁতুলিয়া গ্রামের সীমান্তস্থিত বিল পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে প্রায় দশ ক্রোশ, এবং পশ্চিমে মল্লারপুরের পশ্চিমস্থিত 'শিবপাহাড়ী' হইতে পূর্বে ভাগীরথী তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই অঞ্চলকে মহাভারতের কাহিনীর সহিত জড়িত করিয়া 'গর্ভবাসে'র অদূরে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে বৃক্ষ-লতা পরিবেষ্টিত স্থান পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস-কালীন বাসস্থান অর্থাৎ 'পাণ্ডবতলা' নামে চিহ্নিত হইয়া থাকে। দক্ষিণে ময়ূরাক্ষীতীরে অবস্থিত কোটাসুর বা 'অসুরকোট' এবং বীরচন্দ্রপুরের নিকটবর্তী 'অসুর্লা' বা 'অসুরালয়' গ্রাম বক-রাক্ষসের স্মৃতিবহ। এই সমস্ত জনশ্রুতির কোন ঐতিহাসিক সমর্থন পাওয়া যায় না। এককালে এই সমস্ত অঞ্চল যে 'পাণ্ডববর্জিত' ছিল না তাহা প্রমাণ করিবার জন্য এই সমস্ত প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে মনে হয়। কোটাসুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সাম্প্রতিককালে তাম্রপ্রস্তর যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ আবিষ্কার আমাদের উপরোক্ত ধারণার প্রতি ইঙ্গিত দেয় এবং এই স্থানগুলির প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে।

একচক্রার গৌরব শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু ১৩৯৫ শকাব্দের মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশীতে জন্মগ্রহণ করেন। এই স্থান 'গর্ভবাস' নামে

খ্যাত। কথিত হয় এখানে তাঁহার পিতা হাড়াই পণ্ডিতের বাড়ী ছিল। একটি ইষ্টকালয়ের ধ্বংসাবশেষকে গোস্বামীগণ হাড়াই পণ্ডিতের আবাসস্থল বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। একটি জীর্ণ ইষ্টকালয় ও কিছু জঙ্গলাকীর্ণ স্থান শ্রীনিত্যানন্দের সূতিকাগৃহ বলিয়া কথিত হয়। বীরচন্দ্রপুর হইতে যমুনা নাম্নী একটি ছোট নদী পার হইয়া গর্ভবাসে যাইতে হয়।

শ্রীনিত্যানন্দের বাল্যকালের ঘটনাবলী সম্বন্ধে নানারকম জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। তাঁহার বয়স যখন দ্বাদশ বৎসর সেই সময় শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরী নামক এক সন্ন্যাসী একদিন 'একচক্রা'য় আসিয়া উপস্থিত হন। আপনার তীর্থসহচর করিবার অভিপ্রায়ে ঈশ্বরপুরী নিত্যানন্দের পিতা হাড়াইওঝার নিকট নিত্যানন্দকে প্রার্থনা করেন। হাড়াইওঝা ও নিতানন্দের মাতা পদ্মাবতী নিত্যানন্দকে সন্ন্যাসীর করে সমর্পণ করেন। কথিত আছে যে, তিনি মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্গত পন্ঢারপুরে শ্রীলক্ষ্মী-পতিপুরীর নিকট দীক্ষালাভ করেন। ইহার পর নানা তীর্থস্থান ঘুরিতে ঘুরিতে শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। তথায় নন্দন আচার্য নামে এক পরম-বৈষ্ণবের গৃহে শ্রীচৈতন্যের সহিত তাঁহার মিলন সংঘটিত হয়। পরবর্তীকালে যবন হরিদাসের সহিত নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে হরিনাম প্রচারে ব্রতী হইলেন। নিত্যানন্দের শেষ জীবন অতিবাহিত হয় ২৪ পরগণা জেলার খড়দহে। জনশ্রুতি আছে যে, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সহিত নাম সংকীর্তন করিতে করিতে তিনি তাঁহার জন্মভূমি 'একচক্রায়' আসেন। ১৪৬৪ শকাব্দে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের তিরোভাব হয়।

বীরচন্দ্রপুরের বঙ্কিমরায় শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ শ্রীবীরভদ্রের প্রতিষ্ঠিত। তুই-পার্শ্বে তুই স্ত্রীমূর্তি শ্রীবীরভদ্রের মাতা ও বিমাতা বসুধা ও জাহ্নবার (জাহ্নবীর) প্রতিকৃতি বলিয়া কথিত। তাঁহারা শ্রীরাধিকার ধ্যানে পূজিতা হইতেছেন। এই মন্দিরে আর একটি দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। নিত্যানন্দের পিতৃদেব হাড়াই পণ্ডিতের গৃহদেবতা প্রাচীন দশভুজা মূর্তি ভগ্ন হইবার পর এই নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইহা ছাড়া বীরচন্দ্রপুর ও 'গর্ভবাসে' বৈষ্ণবগণের বিভিন্ন আশ্রমে আরও কয়েকটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন, যথা, বিশ্রামতলায় রামকৃষ্ণ বিগ্রহ, 'গর্ভবাসে' নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ বিগ্রহ, বকুলতলায় রাধাকান্ত বিগ্রহ ইত্যাদি। বীরচন্দ্রপুরের ষষ্ঠীতলায় কয়েকটি ভগ্ন প্রস্তরমূর্তির খণ্ড পড়িয়া আছে, মূর্তি চিনিবার কোন উপায় নাই।

বীরচন্দ্রপুরের বঙ্কিমরায়ের মন্দিরটি সাধারণ আট-চালা মন্দির,

মন্দিরসম্মুখে সমতলছাদবিশিষ্ট স্তম্ভযুক্ত এক মণ্ডপ আছে। ঐস্থানের অন্যান্য মন্দিরগুলিও সাধারণ দালান রীতির। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার চৈত্র ১৩২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত মহারাজকুমার শ্রীমহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী রচিত 'একচক্রা' শীর্ষক প্রবন্ধে উপরোক্ত স্থানসমূহের বর্ণনা আছে এবং 'গর্ভবাসে' শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সূতিকাগৃহের নিকট অবস্থিত এক মন্দিরের আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, বর্তমানে এই মন্দিরটির খুবই জীর্ণ অবস্থা।

বীরনগরঃ মুরারই থানার অন্তর্গত এবং পূর্ব রেলপথের সাহেবগঞ্জ লুপলাইনে রাজগ্রাম রেলষ্টেশন হইতে প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা সীমান্তে অবস্থিত এই গ্রাম। বর্তমানে সাঁওতাল অধ্যুষিত এই গ্রামের মধ্যে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়িয়া অনুচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ বা ঢিবি দেখা যায়। এই সমস্ত ঢিবিগুলির চারিপার্শ্বে মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ, ভগ্ন ইটসমূহ এবং কোথাও কোথাও দেশজ প্রক্রিয়ায় লৌহ নিষ্কাশনের অবশিষ্টাংশ বিক্ষিপ্ত আছে দেখা যায়। জনশ্রুতি আছে যে 'বীর' নামে এক রাজার বাড়ী এইস্থানে ছিল, ঐ স্থানটি বর্তমানে 'রাজবাড়ী'র স্থান-রূপে গ্রামবাসীগণ চিহ্নিত করিয়া থাকেন। উপরোক্ত ঢিবিগুলির উচ্চতা এবং চতুষ্পার্শ্বের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া এই গ্রামের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং প্রাচীনত্ব অনুমিত হয়। বাঙ্গালাদেশের সেনরাজবংশের বংশতালিকা মধ্যে 'বীরসেন' নামে এক নৃপতির উল্লেখ আছে (বিজয়সেনের 'দেওপাড়া প্রশস্তি' এবং লক্ষ্মণসেনের 'মাধাইনগর তাম্রশাসন' দ্রষ্টব্য)। কেহ কেহ অনুমান করেন রাঢ়দেশে সেনরাজগণের আধিপত্যের সুচনা চিহ্নিত-করণের উদ্দেশ্যে চন্দ্রবংশে উদ্ভূত এবং পৌরাণিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পৃক্ত 'বীরসেনের' নামানুসারে বীরনগরের পত্তন সেনরাজগণ কর্তৃক সাধিত হয় এবং বর্তমানে এইস্থানে যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তাহা সেন-রাজগণের স্মৃতি বহন করিতেছে। নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ হইতে সেন-পর্বের শিল্প-শৈলী অনুসরণে নির্মিত প্রস্তরমূর্তিসমূহের আবিষ্কার এবং পাইকোড়ে বিজয়সেনের নাম খচিত শিলামূর্তি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইলেও প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য ব্যতীত এবং অন্য কোন সঠিক উপাদান না পাওয়া পর্যন্ত উপরোক্ত অনুমান সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন হইবে না। স্থানটির প্রত্নতাত্ত্বিক খননের গুরুত্ব অনুভূত হয়।

বেলুটিঃ নান্নুর থানার অন্তর্গত এবং বোলপুর হইতে নান্নুর যাইবার পথের ধারে নান্নুরের প্রায় ৩ মাইল পশ্চিমে বেলুটি গ্রাম অবস্থিত। এখানের উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের পার্শ্বে এক নাতিউচ্চ ঢিবি

'সরস্বতীতলার ঢিবি' নামে খ্যাত। সাম্প্রতিককালে রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের পক্ষ হইতে পরিচালিত এক অনুসন্ধানের ফলে এই ঢিবি হইতে কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্র এবং ছিদ্রযুক্ত মৃৎপাত্রের ভগ্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়া এইস্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উল্লেখযোগ্য যে এই ধরণের মৃৎপাত্র অজয়-উপত্যকায় আদি-ঐতিহাসিক যুগের প্রত্নস্থলে আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রগুলির সহিত সম্পৃক্ত। (*Indian Archaeology 1963-'64, A Review, Ed. by A. Ghosh, p-59* দ্রষ্টব্য।)

বোলপুর-শান্তিনিকেতন : পূর্ব রেলপথের সাহেবগঞ্জ লুপলাইনে অবস্থিত বোলপুর-শান্তিনিকেতন এখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বভারতীর' জন্য বিশ্ববিখ্যাত। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে'র দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত সুরথ রাজা কর্তৃক চণ্ডীর নিকট লক্ষ বলি প্রদত্ত হইবার ফলে 'বলিপুর' হইতে বোলপুর নামের উৎপত্তি এই জনশ্রুতি আছে। নিকটে অবস্থিত সুপুরগ্রামে সুরথরাজার রাজধানী ছিল বলিয়া কিংবদন্তী আছে। সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে তান্ত্রিক উপাসনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিল যাহার ফলে কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে।

ষ্টেশনের অদূরে ভুবনডাঙ্গায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'শান্তিনিকেতন' অবস্থিত। এই স্থানের 'ছাতিমতলা' মহর্ষির সাধনার স্থান রূপে চিহ্নিত; আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মগণের নিকট পবিত্র স্থান রূপে পরিগণিত।

পরবর্তীকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক 'বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠা হইলে এই স্থান সত্যই 'যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্'রূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। এইখানে 'রবীন্দ্রভবনে' কবিগুরুর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং তাঁহার রচিত পাণ্ডুলিপি ও অঙ্কিত চিত্রাদি সংগৃহীত হইয়া জনসাধারণের নিকট প্রদর্শিত হইতেছে। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই সমস্ত বস্তুগুলির প্রয়োজনীয়তা অমূল্য; এইগুলি অবশ্য দর্শনীয়।

বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত '*Visvabharati and its Institutions*' শীর্ষক প্রকাশনাটি বিশ্বভারতী সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্যের সন্ধান দেয়।

সাম্প্রতিককালে এই স্থান হইতে ক্ষুদ্র প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণডিহি : নানুর থানার অন্তর্গত এই গ্রাম দাসকলগ্রাম রেল-ষ্টেশন হইতে উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে চারিদিকে আচ্ছাদিত

দালানসহ ইষ্টক-নির্মিত এক উচ্চাকৃতি নবরত্ন মন্দিরের জীর্ণ অবস্থা দেখা যায়। মন্দিরটির চারিদিকের আচ্ছাদিত দালান ও শীর্ষদেশের পাঁচটি 'রত্নে'র (চূড়া) কোন চিহ্ন বর্তমানে নাই। মন্দিরের পশ্চিমদিকে কিছু অলঙ্করণ আছে। পূর্বে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার সংরক্ষণাধীনে এই মন্দিরটি ছিল, বর্তমানে এই প্রত্নকীর্তিটি রাজ্য সরকারের সংরক্ষণাধীনে আছে। মন্দিরের উপরে (মধ্যের 'রত্ন'টিতে) একটি মূর্তি ক্ষোদিত আছে। মূর্তিটির শিল্পশৈলী দেখিয়া অনুমান করা চলে যে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মন্দিরটি নির্মিত হয়। মন্দিরটির জীর্ণোদ্ধার পূর্ত বিভাগের ঠিকাদারের মাধ্যমে সাধিত হইবার ফলে আশানুরূপ সংস্কার সাধন হয় নাই। চুন, বালি, সিমেণ্টের পলস্তারার আবরণে মন্দিরের প্রাচীন সৌন্দর্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ন। নিকটেই কয়েকটি চার-চালা মন্দির আছে।

ভদ্রকালী ঃ মুরারই থানার অন্তর্গত এবং রাজগ্রাম ষ্টেশনের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণে ভদ্রকালী ও তৎসন্নিহিত ভাটরা গ্রাম ভদ্রসেন রাজার আবাসস্থল রূপে পরিগণিত। এই গ্রামে ভদ্রকালী দেবীরূপে পূজিতা এক অষ্টভুজা মহিষমর্দিনী দেবীর প্রস্তরমূর্তির অবস্থিতি সম্বন্ধে তথ্যাদি পাওয়া যায়। গ্রামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ হইতে মধ্যে মধ্যে প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্তির এবং প্রাচীন সৌধসমূহের আবিষ্কারের কাহিনী শুনা যায়।

ভদ্রপুর ঃ নলহাটী থানার অন্তর্গত এবং পূর্ব রেলপথের নলহাটী-আজিমগঞ্জ শাখার লোহাপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে এই গ্রাম এককালে বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল। প্রায় মুর্শিদাবাদ সীমান্তে অবস্থিত এই গ্রাম ইতিহাস-বিখ্যাত মহারাজা নন্দকুমারের জন্মস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ। বর্তমানে সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার জন্য ভদ্রপুর পর্যন্ত বাস চলাচল করিতেছে, নলহাটী বা রামপুরহাট হইতে এখানে আসিতে এখন কোন অসুবিধা হয় না। বর্তমানে গ্রামের সে পূর্ব গৌরব আর নাই। গ্রামস্থ পুরাতন অট্টালিকাগুলির অধিকাংশই জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে, প্রাচীন জলাশয় বা পুষ্করিণীগুলির অধিকাংশই কচুরীপানাতে পূর্ণ। গ্রামমধ্যে বৃক্ষতলে কোথাও কোথাও ভগ্ন প্রস্তর-মূর্তি 'গ্রামদেবতা' রূপে পূজিত হইতেছে দেখা যায়।

গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে মহারাজ নন্দকুমার নির্মিত রাজপ্রাসাদ জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে এবং তাহা আবর্জনা ও আগাছায় পূর্ণ। অন্দরমহলের কিয়দংশ এখনও দেখা যায়। মহারাজ নন্দকুমার এবং তাঁহার কার্যকলাপ

সম্বন্ধে ইতিপূর্বে নানা পত্র-পত্রিকা এবং গ্রন্থের মধ্যে বহু আলোচনা হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসের যে কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে বা 'বীরভূম বিবরণ' ১ম খণ্ডের 'ভদ্রপুর কাহিনী' শীর্ষক অধ্যায়ে (পৃঃ ৯৯-১৩১) এবং তৎসংলগ্ন পরিশিষ্টে বিস্তৃত বিবরণাদি লিপিবদ্ধ আছে। রাজবাড়ীর কিছু অংশ বর্তমানে সংস্কার করিয়া তথায় মহারাজার বংশধরেরা বাস করিতেছেন।

ভদ্রপুরে বাজারমধ্যে অবস্থিত দেবী ভদ্রকালীর অধিষ্ঠান। সম্ভবতঃ এই দেবীর নাম হইতেই 'ভদ্রপুর' নামের উৎপত্তি। দেবীমূর্তি রাণী ভবানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবাদ আছে যে দেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্গীগণ কর্তৃক ছিন্ন-বিছিন্ন হয় এবং দেবীর বর্তমানে সেই খণ্ডিত অবস্থা।

ভাণ্ডীরবন : সিউড়ী থানার অন্তর্গত এবং সিউড়ীর প্রায় ছয় মাইল পশ্চিমে ভাণ্ডীরবন বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম ও তপস্যাভূমি রূপে খ্যাত এক মনোরম স্থান। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে সুউচ্চ ভাণ্ডীশ্বর বা বিভাণ্ডীশ্বর শিবমন্দির আছে। সম্প্রতি 'বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাষ্ট' কর্তৃক ইষ্টক-নির্মিত মন্দিরের সংস্কারের ফলে প্রায় নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান রামনাথ ভাদুড়ী কর্তৃক প্রাচীন ভাণ্ডীশ্বর শিবমন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপর এই মন্দির ১৬৭৬ শকাব্দে (১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হয়—মন্দিরগাত্রে ক্ষোদিত এক শিলাফলকের উপর উৎকীর্ণ লেখ হইতে এই তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। *Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1921-22* গ্রন্থের ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে মন্দিরটি মাকড়া-প্রস্তরে নির্মিত রেখ দেউল (?), মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৪৫ ফিট (?)। মন্দিরটির কোন অলঙ্করণ নাই। অনাদিলিঙ্গ শিব গর্ভগৃহের প্রায় ৫ ফিট নিম্নে অবস্থিত। মন্দিরের এক আলোকচিত্র উপরোক্ত রিপোর্টের সহিত সন্নিবেশিত আছে (*Plate XXVII B*)। *David McCutchion* এই মন্দিরটি পরিদর্শনের পর মন্দিরটি ইষ্টক-নির্মিত এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। *P. C. Roy Choudhury* প্রণীত *'Temples and Legends of Bengal'* পুস্তকে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু কর্তৃক প্রদত্ত এই মন্দিরের এক আলোকচিত্রে এটি ইষ্টক-নির্মিত দেউল রূপে বর্ণিত হইয়াছে (*Plate 11*)। কবিলাসপুরের মন্দির স্থাপত্য-শৈলীর ধারা এখানে অনুসৃত হয়, অবশ্য ঐ মন্দির হইতে ভাণ্ডীরবনের মন্দিরের উচ্চতা অনেক বেশী।

মন্দিরে প্রবেশদ্বারের উপর ক্ষোদিত লেখ হইতে অবগত হওয়া

যায় যে মন্দিরটি ইষ্টক-নির্মিত, কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উপরোক্ত রিপোর্টে এটি প্রস্তরমন্দিররূপে কি কারণে অভিহিত হইল বোধগম্য হয় না। সম্প্রতি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার সম্পাদিত 'বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ)' গ্রন্থে ভ্রমবশতঃ মন্দিরটি প্রস্তর-নির্মিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (পৃঃ ৪৬৬)।

মন্দিরে ক্ষোদিত লিপিটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"রসাব্ধি ষোড়শ শকে সংখ্যকে শাস্ত্র সম্মতে
রামনাথ দ্বিজঃ কশ্চিৎ ভাত্বড়ী কুল সম্ভবঃ।
ভাণ্ডীশ্বরং শিবং দৃষ্ট্বা একান্তভক্তি সংযুতঃ
তৎপ্রীত্যর্থে বিনির্ম্মায় ইষ্টকময় মন্দিরং॥
বিচিত্রং রচিতং রম্যং রজতাভং পরিস্কৃতং
দদৌ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে
যাচতে তৎপদে ভক্তিং মুক্তিং বা দেহি শঙ্কর॥"

এই গ্রামে অবস্থিত শ্রীশ্রীগোপালদেবের মন্দিরটিও দর্শনীয়। 'বিড়লা জনকল্যাণ ট্রাষ্ট' এই মন্দিরটিরও সংস্কার সাধন করিয়াছেন। মন্দিরের বিগ্রহ শ্রীশ্রীগোপাল সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। রামনাথ ভাত্বড়ী মহাশয় গোপাল মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। গোপাল মন্দিরের প্রবেশদ্বার পূর্বমুখী, সম্মুখে নহবৎ-খানা। মন্দিরচত্বর মধ্যে স্তম্ভোপরি বেষ্টিত নাটমন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরে গোপালজীউর মণিময় দারুমূর্তি, আত্মাশক্তি রাধা এখানে নাই।

ভাণ্ডীরবনের পার্শ্বে অবস্থিত বীরসিংহপুর বা বীরপুর গ্রাম এখন জনবিরল এবং পরিত্যক্ত। তথাকার কালিকামূর্তির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত। কথিত হয় আদিতে রাজনগরের কালীদহের মধ্যে অবস্থিত দ্বীপের উপর এই দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে ঐ জলাশয়ের জল যবনদ্বারা অপবিত্র হইলে প্লাবনের ফলে দেবী বর্তমান স্থানে উপনীত হন। তত্রাবধি এই স্থানে কালিকাদেবী অধিষ্ঠিতা। মন্দিরটি সাধারণ, ভগ্ন অবস্থা। দেবীর সহিত ধর্মঠাকুর ও গ্রামদেবতা বিরাজমান।

ভাদীশ্বর : মুরারই থানার অন্তর্গত এবং মুরারই ষ্টেশনের পূর্বে অবস্থিত এই গ্রামের মধ্যে একটি সুন্দর মনসামূর্তি আবিষ্কৃত হয়। সপ্তফণাবিশিষ্ট সর্পছত্রতলে পদ্মের উপর লীলাসনে দেবী মনসা উপবিষ্টা, বামহস্তে সর্প এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা সম্ভবতঃ বরদানরতা (করতলের অংশ ভগ্ন, এই কারণে সঠিক বলা সম্ভব নয়)। দেবীর কুচযুগল সর্পের দ্বারা পরিবৃত। • পার্শ্বে পদ্মোপরি নাগিনীর অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

দেবীর আসন-নিম্নে স্থাপিত ঘটমধ্য হইতেও সর্প বহির্গত হইতে দেখা যায়, পার্শ্বে করযোড়ে ভক্ত উপবিষ্ট। নিকটেই হরগৌরীর এক ভগ্ন প্রস্তর-মূর্তি স্থাপনার উল্লেখ পাওয়া যায়।

গ্রামের উত্তরপ্রান্তে ষষ্ঠীতলায় ভদ্রসেন রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ-রূপে পরিগণিত এবং ইহার চারিদিকে ভগ্ন ইষ্টক দ্বারা পরিবৃত এক অনুচ্চ ঢিবির উল্লেখও পাওয়া যায়। প্রায় ২৯'২ × ২৪'১ সেন্টিমিটার পরিমাপের চওড়া ইট ও দেওয়ালের অবস্থিতির চিহ্ন এইখানে দেখা যায়। ইহার উত্তরে আর একটি ছোট ঢিবি শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষরূপে স্থানীয় গ্রামবাসীগণ নির্দেশ করেন। খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর স্মৃতিচিহ্নরূপে পরিগণিত এই ঢিবি দুইটি ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা কর্তৃক বর্তমানে সংরক্ষিত আছে। *Ann. Report of the Archaeological Survey of India, 1921-22* গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায় এই ঢিবির উল্লেখ আছে এবং এখানে প্রাপ্ত মনসামূর্তির আলোকচিত্রও [*Plate XXVIII(C)*] দর্শনীয়।

ভীমগড় ঃ খয়রাশোল থানার অন্তর্গত এই গ্রামের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব স্যার আলেকজান্দার কানিংহাম সাহেবের সহায়ক জে. ডি. বেগলার সাহেবের নজরে পড়ে এবং কানিংহাম সাহেবের *Report of the Archaeological Survey of India, Vol VIII* এর ১৪৯-১৫০ পৃষ্ঠায় এই স্থানের বর্ণনা আছে। ভীমগড় রেলষ্টেশন হইতে অনায়াসে এইস্থানে আসা যায়। এই দুর্গের অধিকাংশ স্থান এখন কৃষিক্ষেত্রে পরিণত, পাণ্ডবগণের স্মৃতিচারণ এখন আর শুনা যায় না।

গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে 'ভীমেশ্বর শিবের' মন্দির অবস্থিত। মাকড়া-প্রস্তরে নির্মিত এই মন্দির সাম্প্রতিককালের। গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গের চারিপার্শ্বে ৮টি নব্যপ্রস্তরযুগের কুঠার 'অর্ঘ্যপট্টের' আকারে লিঙ্গটিকে বেষ্টন করিয়া আছে সমীক্ষাকালে দেখা গিয়াছে। উত্তরপ্রদেশের বাঁদা জেলার নব্য প্রস্তরযুগের কুঠারগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে জে. ককবার্ন এই একই রীতির উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এই ধরণের কুঠারের অনেকগুলি তিনি বিরাট আকারের লিঙ্গের সহিত সংযুক্ত যোনিপট্টের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন (*J. R. A. S. B., 1879, pp137-141*)। বীরভূম জেলার ইলামবাজার থানার অন্তর্গত বাতিকার গ্রামে বৃক্ষতলে 'ধর্মঠাকুরের থানে' নব্য প্রস্তরযুগের অনেকগুলি হাত-কুঠারের অবস্থিতি ডঃ অমলেন্দু মিত্র আমাদের গোচরে আনিয়াছেন। (পৃঃ ২৪১ "রাঢ়ে ধর্মপূজা—বীরভূমে ধর্মঠাকুরের পীঠ" শীর্ষক প্রবন্ধ : 'ভাবমুখে' পত্রিকা শারদীয়া সংখ্যা ১৩৭৫ দ্রষ্টব্য)।

মঙ্গলডিহি : ইলামবাজার থানার অন্তর্গত এবং সিউড়ী হইতে দক্ষিণ-পূর্বে ১০ মাইল দূরে এই গ্রাম অবস্থিত। এখানের শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ, মদনমোহন ও বলরামজীউ-এর মন্দির গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট পবিত্র তীর্থরূপে প্রসিদ্ধ।

ময়ূরেশ্বর (মৌড়েশ্বর) : সাঁইথিয়া জংসন রেলষ্টেশন হইতে ময়ূরাক্ষী নদী পার হইয়া বাসযোগে অনায়াসে এই স্থানে আসা যায়। ময়ূরেশ্বর থানার কেন্দ্র এইখানে অবস্থিত। কুলনান্দ রচিত 'গ্রহ-বিপ্র-কুলপঞ্জিকা' হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মৌড়েশ্বর প্রাচীনকালে 'কোট মৌড়েশ্বর' নামে পরিচিত ছিল। 'পৃথু বৃহজ্জ্যোষী' নামক এক গ্রহবিপ্র এই স্থানে আসিয়া বসবাস করেন তাহার উল্লেখ 'রাঢ়ীয় শাকল দীপিকা' গ্রন্থে আছে। মৌড়েশ্বর তখন 'কোট' অর্থাৎ প্রাচীর পরিবেষ্টিত 'দুর্গ' ছিল। মৌড়েশ্বর থানার অন্তর্গত 'কোটাসুর' সম্ভবতঃ এই উক্তি সমর্থন করিতেছে। 'চৈতন্য-ভাগবতে' মৌড়েশ্বর শিবের উল্লেখ পাওয়া যায় :—

"মৌড়েশ্বর নামে দেব আছে কতদূরে।
যাঁরে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে॥"

'ভক্তিরত্নাকরে' লিখিত আছে জাহ্নবীদেবী (নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর স্ত্রী)

"মৌড়েশ্বরে গিয়া কৈলা শিবের দর্শন।
যাঁরে পূজিলেন পদ্মাবতীর নন্দন॥"

জনশ্রুতি আছে মৌড়েশ্বরে মুকুটরায় নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত শিব 'মুকুটেশ্বর' অপভ্রংশে 'মৌড়েশ্বরে' পরিণত হইয়াছে। রাজবাড়ীর ধ্বংসস্তূপ এই গ্রামে আছে শুনা যায়।

পুলিশ থানার অদূরে মৌড়পুর বা মহুরাপুর গ্রামের 'মৌড়েশ্বর শিব'ই উপরোক্ত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ পূজিত শিব কিনা সঠিক বলা যায় না। মৌড়-পুর বা মহুরাপুর গ্রামে একটি পশ্চিমদুয়ারী পঞ্চরত্ন মন্দিরে মৌড়েশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন ('ভারতবর্ষ' পত্রিকার চৈত্র, ১৩২৩ সাল সংখ্যায় প্রকাশিত মহারাজকুমার শ্রীমহিমা নিরঞ্জন. চক্রবর্তী রচিত 'একচক্রা' শীর্ষক প্রবন্ধ ও ঐ প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত আলোকচিত্রসমূহ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)। আবার গ্রামের 'শিব পুষ্করিণী' নামক পুষ্করিণীর মধ্যে মৌড়েশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন শুনা যায়। মন্দিরের অদূরে 'লক্ষ্মী-নারায়ণ' নামে পরিচিত এক প্রস্তরমূর্তির অবস্থিতির কথা উপরোক্ত প্রবন্ধে আছে ও তাহার আলোকচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

মল্লারপুর : ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত এই গ্রাম সাহেবগঞ্জ লুপলাইনে মল্লারপুর ষ্টেশনের পার্শ্বে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে প্রায় দেড়মাইল

পশ্চিমে 'শিববাড়ী' নামক স্থানে অনেকগুলি মন্দির আছে। ষ্টেশন হইতে বাস বা রিক্সায় সিউড়ী রোড অভিমুখে গমন করিলে পথিপার্শ্বে এই মন্দিরগুলি দেখা যায়।

মল্লারপুরের প্রধান মন্দির 'মল্লেশ্বর' শিবমন্দিরের চতুর্দিকে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ও প্রধান তোরণদ্বারের উপর নহবৎখানা প্রতিষ্ঠিত। মন্দির-চত্বর মধ্যে ২৫টি ভিন্ন রীতির মন্দির দেখা যায়। অধিকাংশ মন্দিরই চার-চালা রীতি অনুযায়ী নির্মিত এবং প্রবেশদ্বারের তিনপার্শ্বে ফুলপাথরের ফলকের উপর ক্ষোদিত অলঙ্করণ দৃষ্ট হয়। পূর্বদিকে অবস্থিত মন্দিরগুলির খিলানের উপরিভাগে এবং কোথাও কোথাও লম্বালম্বিভাবে সজ্জিত ফলকের উপর অলঙ্করণ আছে। কৃষ্ণলীলা, কীর্তনের দৃশ্যাবলী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি দেবদেবীর প্রতিমূর্তি এবং পুষ্পসজ্জারই প্রাধান্য এই অলঙ্করণের মধ্যে প্রকাশিত। মন্দিরে একটি লিপি উৎকীর্ণ আছে। '১১২৪' এই বৎসর উল্লেখ আছে। স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা এই তারিখটি শকাব্দের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু মন্দিরগুলির স্থাপত্য-শৈলী দেখিয়া মন্দিরগুলি এত প্রাচীন অর্থাৎ ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এই ধারণা হয় না। তবে মন্দিরের উত্তরদিকে প্রধানদ্বারের নিকট প্রবেশপথে একটি বিরাট প্রস্তর-নির্মিত দ্বারদেশের অংশ পড়িয়া আছে, ইহার মধ্যস্থলে মঙ্গলঘটের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। মন্দির-চত্বরে প্রাচীন প্রস্তর-নির্মিত মন্দির-স্থাপত্যের অংশবিশেষ যথা দ্বারপালের প্রতিকৃতি সম্বলিত দ্বারদেশের অংশ পড়িয়া আছে। শিল্প-শৈলীর বিচারে ঐগুলি দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্থাপত্যের অংশরূপে অনুমিত হয়। বীরভূমের এই অঞ্চলে 'মল্ল' আখ্যায় ভূষিত অনেক গ্রামের অবস্থিতি হেতু কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন যে মল্লভূম হইতে আগত কোন রাজার স্মৃতি এই সমস্ত গ্রামের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। প্রাচীন মল্লভূমি বর্তমান বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ '১১২৪' বৎসরটি মল্লাব্দকে সূচিত করিতেছে কিনা সঠিক বলা যায় না।

মল্লরাজার অলৌকিক কাহিনী সম্বন্ধে এই অঞ্চলে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। পুরাকালে এই অঞ্চল গহন অরণ্যানী দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। এক মেষপালকের পদ্মিনী লক্ষণাযুক্তা কন্যার সহিত এক সন্ন্যাসীর আকস্মিক মিলনের ফলে তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তান 'মল্লনাথ' নামে অভিহিত হন। কালক্রমে তিনি রাজোপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে এই মন্দিরে পূজিত শিবলিঙ্গ 'সিদ্ধনাথ' আত্মপ্রকাশ করেন। পরে এই শিব 'মল্লনাথ' নামে পরিচিত হন।

মন্দির সংস্থানের মধ্যে একটি 'পঞ্চরত্ন' মন্দির আছে। এই মন্দির-গাত্রে প্রাচীনতর পুষ্পসজ্জা ক্ষোদিত আছে। পরবর্তীকালে সংস্কারের চিহ্নও লক্ষিত হয়। পশ্চিমদিকে অবস্থিত মন্দিরের উপরও পরবর্তী-কালের সংস্কারের চিহ্ন বিদ্যমান। পুরাতন মন্দির হইতে উৎক্ষিপ্ত ফলক-গুলি এই মন্দিরগাত্রে নিবিষ্ট আছে দেখা যায়। একটি মন্দির ভোগ রন্ধনের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে। আর একটি অষ্টকোণাকৃতি মন্দিরের ভিতর সিদ্ধেশ্বরী কালী পূজিতা হইতেছেন। এই মন্দিরসংলগ্ন দালানে একটি প্রস্তরমূর্তি লক্ষণীয়। ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট এক দেবমূর্তি এঁইটি, পাদপীঠে কুকুরের প্রতিকৃতি (?) উৎকীর্ণ আছে দেখা যায়, সম্ভবতঃ কোন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি।

উত্তর-পশ্চিমদিকে অবস্থিত মন্দিরটি অতি আধুনিককালের। দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত অন্য সমস্ত মন্দিরগাত্রে কোন অলঙ্করণ নাই।

মন্দিরগুলি বর্তমানে পাণ্ডাদের রক্ষণাবেক্ষণে আছে। যে সমস্ত মন্দিরে অলঙ্করণ আছে সেগুলির সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

এইস্থান হইতে সংগৃহীত আনুমানিক খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শিল্প-শৈলী অনুসরণে নির্মিত একটি বিষ্ণুমূর্তি ও একটি প্রস্তর-নির্মিত নবগ্রহ-ফলক (*S. 167*) বর্তমানে রাজ্য সরকারের সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রীমতী দেবলা মিত্র তাঁহার রচিত *"A Study of some Graha-Images of India and their possible bearing on the Nava-Devas of Cambodia"* প্রবন্ধে (

মল্লিকপুর : সিউড়ী থানার অন্তর্গত রাইপুরের পূর্বে অবস্থিত এই গ্রামের প্রাচীন মন্দিরের অবস্থিতি সম্বন্ধে মুকুল দে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার রচিত *'Birbhum Terracottas'* গ্রন্থে সন্নিবেশিত মানচিত্রে এই স্থান চিহ্নিত আছে। সাম্প্রতিককালে *Mr. David McCutchion*এর পরিদর্শনের পর প্রকাশিত তথ্য হইতে জানা যায় যে এই স্থানের দুইটি প্রাচীন ইষ্টক-নির্মিত মন্দিরের মৃৎফলকগুলি সম্প্রতি পুনর্নির্মিত মন্দিরগাত্রে যত্রতত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে (*'The Temples of Birbhum'* পৃঃ ২৯ দ্রষ্টব্য)।

মহিষদল : বোলপুর থানার অন্তর্গত এবং শান্তিনিকেতনের প্রায় ২ মাইল উত্তর-পূর্বে কোপাই নদীতীরবর্তী এই গ্রাম। সাম্প্রতিককালে

ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার (পূর্বচক্র) কর্তৃক এইস্থানে পরিচালিত খননকার্যের মাধ্যমে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের ফলে অনেক নূতন তথ্যের উদ্ঘাটন হইয়াছে।

খননকার্যে স্তরবিন্যাসের ফলে দুইটি পর্বের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথম পর্বের অন্তর্ভুক্ত স্তরসমূহে মৃত্তিকা এবং বাঁশ বা কঞ্চির দ্বারা নির্মিত গৃহের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গৃহতলে দগ্ধ মৃত্তিকাখণ্ড নিবেশপূর্বক দৃঢ় করিবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বে শুভ্রবর্ণে রঞ্জিত বা সাধারণ শ্রেণীর কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্রের প্রচলন ছিল জানা যায়। এই সঙ্গে লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্রের উপর কৃষ্ণবর্ণের রেখাদ্বারা রঞ্জিত মৃৎপাত্রের নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়। প্রবাহ-নালীযুক্ত পাত্র বা কোশীপাত্রের প্রচলন এই পর্বে ছিল জানা যায়। অন্যান্য প্রত্নবস্তুর মধ্যে ক্ষুদ্র প্রস্তরায়ুধ, তাম্রকুঠার, মৃন্ময় মূর্তি, মৃন্ময় লিঙ্গ, পরিমাপ খণ্ড, অস্থি নির্মিত দ্রব্য, অলঙ্কৃত চিরুণীর খণ্ড, চুড়ি এবং মূল্যবান প্রস্তরের পুঁতি উল্লেখযোগ্য। এই পর্বের মধ্যে দগ্ধ চাউলের সন্ধানও বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

দ্বিতীয় পর্বে পূর্বেকার মত মৃৎপাত্রের প্রচলন ছিল, তবে এগুলি একটু স্থূলাকৃতি বিশিষ্ট। এই পর্বে ধূসর এবং পাণ্ডু বর্ণের মৃৎপাত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। লৌহের ব্যবহারও আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর মাধ্যমে যথা, তীরের ফলা, বর্শাফলক, খনিত্র এবং কীলক ইত্যাদির ব্যবহারে জানা যায়। লৌহপিণ্ড এবং নিষ্কাশনের অবশিষ্ট অংশসমূহ তৎকালীন লৌহ নিষ্কাশন পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করে। একটি মৃন্ময় মুদ্রাঙ্কের উপর দুইটি নূতন ধরণের সাঙ্কেতিক চিহ্ন উৎকীর্ণ দেখা যায়। ক্ষুদ্র প্রস্তরায়ুধের ব্যবহার এই পর্বে ছিল। সঞ্চরণরত হস্তীর দগ্ধ মৃত্তিকা-মূর্তির ভগ্ন অংশ এই পর্বের প্রত্নবস্তুর মধ্যে অন্যতম। (*Indian Archaeology, 1963-'64, A Review, Edited by A. Ghosh, pp59-60* দ্রষ্টব্য।)

সম্প্রতি প্রকাশিত *Bidget and Raymond Allchin* রচিত "*The Birth of Indian Civilization*" (*India and Pakistan before 500 B.C.*) *Pelican Series, 1968* শীর্ষক গ্রন্থে এই স্থান সম্বন্ধে কিছু বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে (পৃঃ ১৯৮-১৯৯, ২১৮, ২৬৫, ৩৩০ এবং ৩৩৭ দ্রষ্টব্য)। রেডিও কার্বন পদ্ধতির সাহায্যে এখানের প্রথম পর্বের প্রত্নবস্তু পরীক্ষাপূর্বক খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮০ অব্দ হইতে খ্রীষ্টপূর্ব ৮৫৫ অব্দের মধ্যে তিনটি তারিখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পর্বের সময় নিরূপণ ঐ একই

পদ্ধতির সাহায্যে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৬৯০ অব্দের পূর্বে যে এই সাংস্কৃতিক বিকাশ সাধিত হয় তাহা জানা যায়।

মহুলা : সিউড়ি শহর হইতে ৭ মাইল (১১ কিলোমিটার) পশ্চিমে সিউড়ি থানার অন্তর্গত এ গ্রামের একমাত্র পুরাকীর্তি প্রস্তর-নির্মিত মউলেশ্বর শিবের মন্দির। শিবের নাম হইতেই গ্রামের নামের উৎপত্তি হইয়াছে এই ধারণা। সপ্তরথ-শিখরবিশিষ্ট, আমলকশোভিত, দক্ষিণমুখী এ দেবালয়কে কবিলাসপুরের বিখ্যাত মন্দিরটির ক্ষুদ্রতর সংস্করণ বলা যায়। দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৪ ফুট (৪·২ মিটার) ও উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট (১০·৫ মিটার), এ মন্দিরের রথপগবিন্যাসও অবিকল কবিলাসপুরের মত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। একদুয়ারী প্রবেশপথটি অতিশয় ক্ষুদ্র ও মন্দিরের ছাদ ধাপ পদ্ধতিতে নির্মিত। প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম ও কাল অজ্ঞাত হইলেও আকারপ্রকারে এটিকে তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। প্রবেশপথের ঠিক উপরে যুদ্ধরত দুই হস্তীর ও শিখরগাত্রে কৃষ্ণের গাভীদোহন ও তপস্যাক্লিষ্ট সন্ন্যাসীর যে মূর্তিভাস্কর্যগুলি ক্ষোদিত আছে তাহা অভিনব কেননা কবিলাসপুরের বৃহত্তর মন্দিরটিতেও এ জাতীয় অলংকরণ নাই। [এ নিবন্ধটি পূর্ত বিভাগের যুগ্ম-সচিব শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত বিবরণের ভিত্তিতে রচিত।]

মাড়গ্রাম : রামপুরহাট থানার অন্তর্গত এবং রামপুরহাট হইতে প্রায় ৩ মাইল পূর্বে রামপুরহাট-বিষ্ণুপুর সড়কের ধারে অবস্থিত মাড়গ্রাম মুসলমান প্রধান গ্রাম। এই গ্রাম সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতি ও প্রবাদকাহিনী প্রচলিত আছে। পুরাণে বর্ণিত মাণ্ডব্যমুনির আশ্রম এই গ্রামে ছিল এবং সেই নাম হইতে গ্রামের নাম মাড়গ্রাম হইয়াছে এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। গ্রামের দক্ষিণে দ্বারকা নদীর তীরে এই মুনির আশ্রম ছিল বলিয়া স্থানীয় প্রবাদ। ফকীর-শা-মাদার এই স্থানে আসিয়া আস্তানা স্থাপন করেন। মাড়গ্রামে মানপতি নামক রাজার আধিপত্যের কাহিনীও প্রচলিত আছে। কথিত আছে দিল্লীশ্বর সুলতান মহম্মদ বিন্ তোঘলক শাহের রাজত্বকালে তাঁহার এক আত্মীয় "শা জাফর খাঁ গাজী ওরফে মহম্মদ হোসেন" নামক এক মুসলমান ফকীর মাণ্ডব্যপুরে (বর্তমান মাড়গ্রাম) আসিয়া উপস্থিত হন এবং মানপতিকে পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রবাদ আছে কোথাকার বিনোদ নামক (ভূদেব ?) রাজার সঙ্গে যুদ্ধে গাজী সাহেব নিহত হন। তাঁহার মস্তক নাকি ত্রিবেণী অঞ্চলে

পড়িয়া আছে, দেহ মাড়গ্রামে সমাধিস্থ আছে। যেখানে মাণ্ডব্যেশ্বর শিবলিঙ্গ ছিলেন গ্রামের পূর্বদিকে সেইখানেই গাজীর সমাধি হয়। মূল সমাধি দুইভাগে বিভক্ত, ইহার একটিতে গাজী সাহেবের এবং অপরটিতে তাঁহার ভগিনী সমাহিত হইয়াছেন কথিত হয়। আশে-পাশে আরও কয়েকটি সমাধি আছে। সমাধিক্ষেত্রের সাম্প্রতিককালে সংস্কারসাধন করা হইয়াছে। মাড়গ্রামের অন্য তিনদিকে আরও তিনজন পীরের সমাধি আছে। সিউড়ী হইতে প্রকাশিত 'শান্তিদূত' পত্রিকায় (১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা) ডাঃ আলী হায়দার সিদ্দিকী রচিত 'মাড়গ্রামের আত্মকাহিনী' শীর্ষক প্রবন্ধে এই স্থান সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

জাফর খাঁ গাজী সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত। বিনয় ঘোষ প্রণীত 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' শীর্ষক গ্রন্থে 'জাফর খাঁ গাজী' শীর্ষক অধ্যায়ে (পৃঃ ৪৯০-৪৯৫) প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে "চাকলা মুকসুদাবাদ, পরগণা কোনওয়ারের অন্তর্ভুক্ত মুণ্ডগাঁ থেকে জাফর খাঁ গাজী তাঁর ভাগনে বা ভাইপো শাহ সুফীর (পাণ্ডুয়ার) সঙ্গে ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম অঞ্চলে আসেন ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য। প্রথমে তিনি মান নৃপতিকে ধর্মান্তরিত করে দীক্ষা দেন এবং পরে মহানাদের কাছে ভূদেব নৃপতির সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। তাঁর মুণ্ডটি যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে থাকে এবং দেহটি ত্রিবেণীতে সমাধিস্থ করা হয়।" উপরোক্ত আলোচনার ফলে ত্রিবেণীর ঐতিহাসিক জাফর খাঁ গাজীর সহিত মাড়গ্রামের জনশ্রুতি-মধ্যে নিহিত জাফর খাঁ গাজীর সহিত কিছু সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়, তবে তাঁহাদের আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে মত-পার্থক্য আছে। উভয় স্থানে বর্ণিত 'মানরাজা' সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। ত্রিবেণীর জাফর খাঁ গাজীর ন্যায় মাড়গ্রামের জাফর খাঁ গাজীর সমাধি আজও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে শ্রদ্ধার্ঘ পাইয়া আসিতেছে। এখানের সমাধির পার্শ্বে অবস্থিত লুপ্তপ্রায় শিবলিঙ্গ এখনও স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানের শ্রদ্ধার স্মারকরূপে গণ্য।

মিত্রপুর : মুরারই থানার অন্তর্গত এবং পাইকোড় হইতে প্রায় ৩ মাইল পূর্বে মুর্শিদাবাদ সীমান্তে অবস্থিত এই গ্রাম চেদীরাজ কর্ণদেবের সহিত পাল নৃপতির মিত্রতার স্মৃতিবহ স্থানীয় জনশ্রুতি বর্তমান। গ্রামের দক্ষিণে ইষ্টক-নির্মিত 'জোড়-বাংলা' নামে অভিহিত এক মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। এই গ্রামের উত্তরে অবস্থিত ননগড়ে 'রাজা মহীপালের দীঘি' নামে এক বিরাট দীঘির অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।

দীঘিটি পাল সম্রাট মহীপালদেবের স্মৃতি বহন করে এবং গ্রামটির নাম সম্রাট নয়পালদেবের নাম হইতে উদ্ভূত হইয়া 'নয়গড়' এবং পরবর্তী-কালে 'ননগড়ে' পরিণত হইয়াছে এই কিংবদন্তী প্রচলিত।

মুন্দিরা : ইলামবাজার থানার অন্তর্গত এবং জয়দেব-কেন্দুলীর নিকটবর্তী অজয় নদতীরবর্তী এই গ্রামে সাম্প্রতিককালে প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার ফলে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এইস্থান হইতে শেষ প্রস্তরযুগে ব্যবহৃত প্রস্তরায়ুধ এবং কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। অজয় তীরবর্তী তাম্রপ্রস্তর-যুগের সংস্কৃতির অঙ্গীভূত এই সমস্ত প্রত্নবস্তু স্থানটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত দেয়।

মুলুক : বোলপুর থানার অন্তর্গত এবং বোলপুর-পালিতপুর সড়কে বোলপুর হইতে প্রায় ২ মাইল দূরে এই গ্রাম অবস্থিত। এইখানে শ্রীশ্রীরামকানাই ঠাকুরের পাঠবাড়ী ও সমাধি আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম পার্শ্ব সহচর পণ্ডিত ধনঞ্জয়ের কনিষ্ঠ সহোদর সঞ্জয়ের পৌত্র এবং যদুচৈতন্যের পুত্র রামকানাই ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রায় শত বৎসর পরে আবির্ভাব হয়। একনিষ্ঠ সাধক শ্রীরামকানাই ঠাকুরের গুণাবলী এবং অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় জানিতে পারিয়া রাজনগর রাজ এই সাধু সন্দর্শনে আসেন কথিত হয়। ঠাকুরের ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া দেবসেবার নিমিত্ত জমি দান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীরামকানাই ঠাকুর ভোগের অন্ন যতদূর পর্যন্ত ছড়াইতে পারিয়াছিলেন সেই সীমা পর্যন্ত সমস্ত জমি দেবসেবার জন্য প্রদত্ত হয় বলিয়া প্রকাশ। সেই জমির পরিমাণ প্রায় ৩৬০ বিঘা এবং সেই অঞ্চল 'চক-ভাতুরা' নামে পরিচিত।

এইখানে শ্রীরামকানাই বৃন্দাবনের গুপ্ত অস্তিত্ব অনুভব করিয়া মুলুক শ্রীপাটের প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানের ঠাকুরবাড়ীতে শ্রীশ্রীরাধা-বল্লভ জীউর ও শ্রীমতীর মূর্তি এবং শ্রীচৈতন্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেবী অপরাজিতা ও রামেশ্বর শিবমন্দিরও এইখানে অবস্থিত।

সমতল ছাদবিশিষ্ট এই মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির অবস্থিত। চারটি স্তম্ভের উপর ন্যস্ত পাঁচটি খিলানের উপর মন্দিরের সমতল ছাদ অবস্থিত। মন্দিরগাত্রে কোন অলঙ্করণ নাই। শ্রীরামকানাইএর আবির্ভাবকালে সমাজে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদিগের মধ্যে তীব্র

বৈরীভাব বিদ্যমান ছিল। রামকানাই ঠাকুর ধর্মের মধ্যে সঙ্কীর্ণতার কোন প্রশ্রয় না দিয়া সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। একদিকে তিনি যেমন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন অপরদিকে শ্রীরামেশ্বর শিব এবং অপরাজিতা দেবীর মূর্তি স্থাপন করিয়া শিব ও শাক্ত আরাধনার ব্যবস্থা করেন। এইস্থানে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তধর্মের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর জন্মস্থানের নিকটবর্তী বীরচন্দ্রপুরে বৈষ্ণব ও শাক্তধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পন্থাকেই অনুসরণ করিয়াছে।

গোষ্ঠাষ্টমীর সময় চারিদিনব্যাপী মুলুকের মেলা হয়। ঐ মেলার অন্যতম আকর্ষণ হইতেছে রসপর্যায়ে কীর্তন গান। বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বাউলগণের সমাবেশও ঐ সময় ঘটে।

মেহগ্রাম : নলহাটী থানার অন্তর্গত এই গ্রাম নলহাটী হইতে কয়েক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এককালে গ্রামটি খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল। গ্রামের মধ্যে 'গড়বাড়ী'র প্রাচীরের চিহ্ন এখনও গ্রামবাসীরা দেখাইয়া থাকেন। গড়বাড়ীর নিকট ৩টি চার-চালা শিবমন্দির আছে, সম্ভবতঃ আরও কয়েকটি মন্দির ঐ স্থানে ছিল, ভিতের চিহ্ন দেখিয়া মনে হয়। মন্দিরগুলি পশ্চিমদুয়ারী। উত্তরদিকের মন্দিরগাত্রে দ্বারের তিনদিকে মৃৎফলকের উপর সুন্দর অলঙ্করণ আছে। মধ্যস্থলে রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্যাবলী, লম্বভাবে সজ্জিত দশাবতারসমূহের প্রতিকৃতি, গৌর-নিতাইএর প্রতিকৃতি, শাক্তদেবী দুর্গা, কালী ইত্যাদির প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। শিল্প-শৈলী দেখিয়া মনে হয় মন্দিরটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্মিত হয়। মধ্যের মন্দিরটির দ্বারোপরি রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ আছে, শিল্প-শৈলী একটু স্থূলভাবাপন্ন, অন্যত্র কোথাও অলঙ্কৃত মৃৎফলক নাই। মন্দিরের কার্ণিশে পাখীর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। সর্বদক্ষিণে মন্দিরগাত্রে এই একই শিল্প-শৈলীর অনুসরণে নির্মিত শাক্তদেবী কালীর প্রতিকৃতি ক্ষোদিত আছে। মন্দিরগুলি সংরক্ষণযোগ্য। গ্রামের পূর্বদিকে একস্থানে একত্র চারটি সাধারণ চার-চালা রীতির মন্দিরের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মন্দির-গাত্রে নিবিষ্ট শিলালেখ হইতে জানা যায় বঙ্গাব্দ ১৩২৪ সালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সড়কের ধারে একটি পুষ্করিণীতীরে সাধারণ চার-চালা রীতির 'জোড়া-মন্দির' দেখা যায়।

গ্রামের 'মে-চণ্ডী' তলায় পূজিত গ্রামদেবতাগণের মধ্যে প্রস্তর-নির্মিত একটি ক্ষুদ্র রেখ-দেউলের ভগ্ন অংশ পড়িয়া আছে।

রসা: খয়রাশোল থানার অন্তর্গত বীরভূম জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রান্তে এই গ্রাম অবস্থিত। পাণ্ডবেশ্বর-পলাশস্থলী নামে অভিহিত পূর্ব রেলপথের যে শাখা-লাইন গিয়াছে সেই রেলপথে এইস্থানে আসা যায়। এই গ্রামের একস্থানে ৪টি প্রস্তর-নির্মিত মন্দির আছে। এই মন্দির-সংস্থানের মধ্যে বৃহৎ 'আদিনাথ শিবমন্দির' রূপে অভিহিত মন্দিরগাত্রে প্রতিষ্ঠাফলকে ১৫৭৬ শকাব্দ (১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) উৎকীর্ণ আছে। বর্ধমান জেলার সর্পিগ্রামের জমিদার অর্জুন রায়চৌধুরী কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হয় জানা যায়। ওড়িশার স্থাপত্য-শৈলীর অনুকরণে এই মন্দির নির্মিত। কয়েকটি ভাস্কর্য (যথা বৃষের উপর শিব-পার্বতী) মন্দির মধ্যে নিবিষ্ট আছে। এই মন্দিরসংস্থানের অপর ৩টি মন্দিরের মধ্যে একটি 'রেখ দেউল' বৃক্ষের কবলগ্রস্ত, দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণরূপে ভূমিসাৎ হইয়াছে ও তৃতীয়টি একটি বৃহৎ বটবৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া দণ্ডায়মান, তথায় একটি প্রস্তর কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। (*David McCutchion* রচিত "*The Temples of Birbhum*" শীর্ষক প্রবন্ধের ৫ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) কালী-মন্দিরের বিপরীত দিকে অবস্থিত একটি মন্দির সম্প্রতি রাজ্য-সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত হইয়া সংস্কারের অপেক্ষায় আছে।

রাইপুর: সিউড়ী থানার অন্তর্গত এবং সিউড়ীর ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চন্দ্রভাগা নদীতীরে অবস্থিত এই গ্রামের এক মন্দিরের উল্লেখ মুকুল দে রচিত '*Birbhum Terracottas*' গ্রন্থে আছে (পৃঃ ৪১-৪২)। ১৯৬৪ সালে এই মন্দিরের সমস্ত সুন্দর অলঙ্করণে শোভিত মৃৎফলকগুলি অপসারিত হয়। মন্দিরটির এখন জীর্ণ অবস্থা। গ্রামমধ্যে একস্থানে ৪টি মন্দির আছে। একটি আট-চালা মন্দিরের গাত্রে প্রতিষ্ঠাফলকে ১৬৯৫ শকাব্দ (১১৮০ বঙ্গাব্দ) উৎকীর্ণ আছে দেখা যায়, এখানের আর দুইটি মন্দির চার-চালা। মন্দিরসম্মুখে বৃষোপরি নন্দীভৃঙ্গীসহ শিবের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ দেখা যায়। ময়রাপাড়ায় তিনটি দেউল (ইষ্টক-নির্মিত) আছে। প্রতিষ্ঠাফলকে ১৭৬২ শকাব্দ (১২৪০ বঙ্গাব্দ) উৎকীর্ণ আছে। গ্রামমধ্যে পরিত্যক্ত এক সুউচ্চ গোলাকৃতি সৌধ দৃষ্ট হয় সম্ভবতঃ সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার উদ্দেশ্যে অথবা 'সিমাফোর টাওয়ার' (?) রূপে সৌধটি ব্যবহৃত হইত। গ্রামের বৃক্ষতলে ধর্মঠাকুরের কূর্মমূর্তি আছে।

রাজনগর: সিউড়ী হইতে প্রায় ১৬ মাইল পশ্চিমে এই গ্রাম অবস্থিত। এককালে বীরভূমের রাজধানী ছিল রাজনগর, মুসলমান ঐতিহাসিকগণের নিকট তাহা 'লক্ষ্ণোর' নামে অভিহিত হয়। হিন্দু-

রাজগণের আধিপত্য শেষ হইলে এই স্থান মুসলমান জায়গীরদার বা ফৌজদারদের দখলে আসে। *W. W. Hunter* রচিত '*A Statistical Account of Bengal (Vol IV), Birbhum District*' গ্রন্থে পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত ঐতিহাসিক বিবরণীসমূহ "*Pandit's Chronicle of Birbhum*" শীর্ষক এক পরিশিষ্টে সংযোজিত আছে। রাজনগরের প্রাচীন ইতিহাস এই বিবরণীর মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে। বীরভূমে বীররাজা নামে এক রাজার আধিপত্যের জনশ্রুতি আছে। নগরে বা রাজনগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। কথিত আছে মুসলমান-গণের আগমনের পূর্বে 'বৈদ্য রাজবংশের' (সেন রাজবংশ?) রাজত্বকালে নগরে হিন্দু বীর ব্রাহ্মণ রাজা তাঁহার রাজধানী সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পার্শ্ববর্তী সমস্ত অঞ্চলের রাজারা এই বীররাজাকে সার্বভৌম নৃপতিরূপে স্বীকার করিয়া লন। কালক্রমে এই অঞ্চলে পাঠানদের আধিপত্য বিস্তৃত হইতে থাকিলে বীররাজা তাহাদের বাধাদানপূর্বক দেশকে অত্যাচারীদের হাত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। অবশেষে আসাদুল্লা খান এবং জোনেদ্ খান নামে দুই পাঠান সেনানী তাঁহাদের শৌর্য ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা বীররাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন, এবং রাজার বিশ্বস্ত সচিব পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কালক্রমে রাণীর সহযোগিতায় এই দুই পাঠান মন্ত্রী কৌশলে রাজাকে হত্যা করিয়া এখানে মুসলমান রাজত্বের সূচনা করেন।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক লক্ষ্য করা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই রাজনগরে মুসলমান শাসকগণের আধিপত্যের সূচনা হয়। বঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের অরণ্য অধ্যুষিত প্রদেশ হইতে আগত পার্বত্য ও বন্য জাতিদের আক্রমণ নিরোধের জন্য রাজ-নগরে বক্তিয়ার খিলজীর সময় হইতে কয়েকজন পাঠান সৈন্যসহ এক ঘাঁটি স্থাপন করিবার ব্যবস্থা হয়। পরবর্তী সুলতানগণের নিকট হইতে নগরের এই সকল পাঠান রক্ষকগণ এতদঞ্চল জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন। (গৌরীহর মিত্র রচিত 'বীরভূমের ইতিহাস', প্রথম খণ্ডে 'রাজনগরের রাজা বা ফৌজদারগণ' শীর্ষক অধ্যায়ে এখানের ফৌজদারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, পৃঃ ১০৯-১২১ দ্রষ্টব্য।) এখানের রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ, তোরণদ্বার ইত্যাদির আলোকচিত্র ঐ গ্রন্থ মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। হাটতলার নিকট অবস্থিত দ্বিতল ইমামবাড়ার ভগ্নাবশেষটি দর্শনীয়। এই ইমামবাড়ার প্রাঙ্গণে দেওয়ান বাদীউল জমা খাঁর দুই পুত্র আহম্মদউল জমা খাঁ ও মহম্মদ আলিনকি খাঁর মরদেহ পাশাপাশি সমাহিত করা

হয়। এই দুইজন মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজোদ্দৌলার খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে কলিকাতা দুর্গ আক্রমণকালে এই দুইজন নবাবের সঙ্গী হন। কলিকাতা লুণ্ঠনপূর্বক আলিপুর নগরের পত্তন এই আলিনকী খান দ্বারা সাধিত হয় জনশ্রুতি আছে।

ইমামবাড়ার পার্শ্বে অবস্থিত 'কালীদহ' নামে বিরাট জলাশয়ের মধ্য-স্থলে এক বিরাম-নিকেতনের (?) ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কথিত আছে, হিন্দুরাজগণের প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির এই স্থানে ছিল, পরে কোন এক মুসলমান কর্তৃক এই জলাশয় অপবিত্র হইলে এই জলাশয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্লাবন উপস্থিত হয় এবং এখানের কালীমূর্তিটি প্লাবনে ভাসিয়া গিয়া বর্তমানে সিউড়ী থানার অন্তর্গত বীরসিংহপুর বা বীরপুর গ্রামে উপনীত হয়। ঐ স্থানে ঐ কালীমূর্তি এক্ষণে পূজিতা হইতেছেন। গৌরীহর মিত্র অবশ্য অনুমান করেন যে, ১২৪৩ খ্রীষ্টাব্দে (হিজরী ৬৪২ সালে) গৌড়ের সুলতান ইজুদ্দীন তুঘান খাঁর রাজত্বকালে ওড়িশার অধিপতি যখন রাঢ়দেশ অধিকার করিয়া লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ করেন, সেই সময় ওড়িশারাজের রাঢ় বিজয়ের স্মারক হিসাবে জলমধ্যস্থ এই বিরাম-নিকেতন নির্মিত হয়। (পৃঃ ৭৭ এবং আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য।)

অবশ্য এই স্থানের প্রাচীনতম কীর্তিটি হইতেছে এখানকার 'মতিচূড়া মসজিদে'র ধ্বংসাবশেষ। মসজিদটি বর্তমানে উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হয় না, সরকারী খাসজমিতে অবস্থিত এই মসজিদের সম্মুখে ঘরবাড়ী তুলিয়া প্রবেশপথ প্রায় অবরুদ্ধ। স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ও আবর্জনায় পরিপূর্ণ। মসজিদের শিল্প-শৈলী দেখিয়া অনুমান করা হয় আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীতে এইটি নির্মিত হয়। উপরে ছয়টি গম্বুজের প্রায় অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইষ্টক-নির্মিত এই মসজিদের অলঙ্করণ দর্শনীয়। মতিচূড়া মসজিদে ঐতিহ্যমণ্ডিত ইসলামী অলঙ্কার ও হিন্দুরীতির রূপ-সজ্জার সংমিশ্রণ লক্ষণীয়। সম্মুখে মৃৎফলকে রজ্জু, পত্রাবলী, ক্ষুদ্র মিনার, অর্দ্ধস্তম্ভ এবং নকলদ্বার ইত্যাদির রূপায়ণ এবং অলঙ্করণ হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য-শৈলী ও ভাস্কর্যের মধ্যে শিল্পরীতির এক ধারা-বাহিকতার বাণী ব্যক্ত করে। ['এক্ষণ' কার্তিক-মাঘ ১৩৭৫ (ষষ্ঠ বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা) পত্রিকায় ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন রচিত "বাংলা দেশে হিন্দু-মুসলিম শিল্পরীতির ধারাবাহিকতা শীর্ষক" প্রবন্ধ (পৃঃ ১-১৭) দ্রষ্টব্য]। মসজিদটি বর্তমানে রাজ্য সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়া সংস্কারের অপেক্ষায় আছে।•

রামনগর : ময়ুরেশ্বর থানার অন্তর্গত এবং প্রায় মুর্শিদাবাদ সীমান্তে এই গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে দুইটি মন্দির আছে। একটি বৃহৎ আকারের চার-চালা মন্দির, মন্দিরগাত্রে কোন অলঙ্করণ নাই। আর একটি ক্ষুদ্র চার-চালা মন্দির ইহার পার্শ্বে অবস্থিত। ১৬৬০ শকাব্দে বা ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরগাত্রের মৃৎফলকের উপর সুন্দর অলঙ্করণ আছে। মন্দিরটির অবস্থাও ভাল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক এই মন্দিরটি সংরক্ষিত হইয়াছে। রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্যাবলী প্রবেশপথের উপর খিলানগাত্রে উৎকীর্ণ আছে। চার-চালা রথোপরি দণ্ডায়মান দুই বীর যোদ্ধা, বানর সেনা ও রাক্ষস সৈন্যগণ উপরিভাগে যুদ্ধে ব্যাপৃত দেখা যায়। ঠিক খিলানের উপর আট-চালা ক্ষুদ্রাকৃতি শিবমন্দিরগুলির প্রতিকৃতিও দর্শনীয়। অলঙ্করণের জন্য শিল্পীর স্বল্পতম স্থানের মধ্যে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা এবং সেগুলির রূপায়ণ শিল্প-শৈলীকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। লম্বালম্বিভাবে সজ্জিত ক্ষুদ্র আকারের মৃৎফলকে দশাবতার এবং অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে দেখা যায়।

রামপুরহাট : রামপুরহাট বীরভূমের অন্যতম প্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র। সাহেবগঞ্জ লুপলাইনে অবস্থিত রেলষ্টেশনের পার্শ্বেই এই মহকুমা শহরটি অবস্থিত। সাঁওতাল বিদ্রোহকালীন হ্যামটন সাহেব কর্তৃক নির্মিত এক গোলঘর এই স্থানে আছে।

রায়পুর : বোলপুর থানার অন্তর্গত এই গ্রাম লর্ড সিংহ পরিবারের বাসস্থানরূপে প্রসিদ্ধ। এখানে গ্রামের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ চার-চালা রীতির মন্দির আছে। নিকটে একটি দালান মন্দির ধর্মদেবতার মন্দির বা 'ধর্মগড়' নামে খ্যাত।

লাভপুর : আহমেদপুর-কাটোয়া লাইনে অবস্থিত একটি ষ্টেশন। লাভপুর একটি সমৃদ্ধিশালী স্থান। এই থানার কেন্দ্র এইখানে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে লাভপুরে প্রাচীনকালে এক মৈথিলী ব্রাহ্মণ রাজা রাজত্ব করিতেন। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে ওসমান নামে এক মুসলমান এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং তাঁহার বংশধর মহম্মদ ফাজেল সবিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গড়ের শেষ চিহ্ন লাভপুরে বিদ্যমান থাকিবার কথা শুনা যায়। পরবর্তীকালে লাভপুরে ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ প্রসার লাভ করে।

লাভপুরের পূর্বপ্রান্তে 'ফুল্লরা-মহাপীঠ'। দেবীর মন্দির সম্মুখে নাট-

মন্দির। সতীর 'ওষ্ঠ' এখানে পতিত হয় 'পীঠনির্ণয় তন্ত্রে' উল্লিখিত আছে:—

'অট্টহাসে চোষ্ঠপাতো দেবী সা ফুল্লরা স্মৃতা।

বিশ্বেশো (পাঠান্তরে বিশ্বেশো) ভৈরবস্তত্র সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়কঃ॥'

'জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে' এই পীঠের উল্লেখ আছে। 'বৃহন্নীলতন্ত্রে' উল্লিখিত এই পীঠের দেবী ভীমকালী নামে পরিচিতা ('অট্টহাসে মহাপীঠে ভীমকালী চ কালিকা')। 'শিবচরিতে'র মতে অট্টহাস 'উপপীঠ'রূপে পরিগণিত, তথায় সতীর 'ওষ্ঠাংশ' পতিত হয় জানা যায় এবং দেবীর নাম 'ফুল্লরা' ও ভৈরবের নাম 'বিশ্বনাথ'। 'প্রাণতোষণী তন্ত্রে'র মতে দেবীর নাম 'চামুণ্ডা' বা কোন কোন পুঁথিতে তাঁহাকে 'মহানন্দা'রূপে এবং ভৈরবের নাম 'মহানন্দ'রূপে উল্লেখ আছে। (*Dr. D. C. Sircar* প্রণীত '*The Sakta Pithas*' প্রবন্ধের ৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) অন্যান্য উপকরণের মধ্যে 'সুরা' না দিলে দেবীর ভোগ হয় না।

প্রধান মন্দিরটির কোন স্থাপত্য-সৌন্দর্য নাই। সাধারণ দালান রীতির মন্দির। এই মন্দিরপ্রাঙ্গণে ১২৫৯ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত এক আট-চালা মন্দির আছে। মুকুল দে প্রণীত '*Birbhum Terracottas*' গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠায় এই মন্দিরে নিবিষ্ট লেখযুক্ত এক ফলকের উল্লেখ আছে। প্রবেশপথের উপর সিংহাসনে উপবিষ্ট রাম-সীতার মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। দুইপার্শ্বে কৃষ্ণলীলা এবং অন্যান্য দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ। উপরোক্ত গ্রন্থে রাম-সীতা মৃৎফলকের আলোকচিত্র আছে।

লোহাপুর: নলহাটী থানার অন্তর্গত এবং নলহাটী-আজিমগঞ্জ শাখা রেলপথে অবস্থিত লোহাপুর একটি ষ্টেশন। ইহা ছাড়া রামপুরহাট বা নলহাটী হইতে বাসে এখানে যাতায়াত করা যায়। ষ্টেশনের উত্তরে ময়ুরাক্ষী সেচ বিভাগের একটি বাংলো আছে। প্রবাদ আছে একসময় এই গ্রামের চারিপার্শ্ব নিবিড় অরণ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল। এই অরণ্যমধ্যে তান্ত্রিক সাধকগণের সাধনার স্থান ছিল। বর্তমানে সেই সব কিছুই নাই।

কয়েক বৎসর পূর্বে এইস্থানে সড়ক নির্মাণকালে শতাধিক অঙ্ক চিহ্নযুক্ত রৌপ্য মুদ্রা (*Silver Punch-marked Coins*) আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে ঐগুলি কলিকাতায় রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত হইতেছে। সাধারণতঃ চতুষ্কোণাকৃতি বা আয়তাকার রৌপ্য-খণ্ডের উপর বিভিন্ন ধরণের অঙ্ক-চিহ্নসমূহ (*Symbols*) উৎকীর্ণ আছে দেখা যায়। মুদ্রাতত্ত্ববিদগণ এই সমস্ত অঙ্কসমূহের অবস্থিতি হইতে অনেক

তথ্য আহরণ করেন। উত্তরভারতে সাধারণতঃ মৌর্যযুগে প্রচলিত এই ধরণের মুদ্রাগুলি তৎকালীন অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার প্রতি ইঙ্গিত দেয়। এই অঙ্ক-চিহ্নগুলির সহিত কোন ধর্মীয় যোগাযোগ আছে কিনা এই সিদ্ধান্তে আসা সমীচীন হইবে না। 'কার্ষাপণ' বা 'কাঁহাপণ' আখ্যায় ভূষিত এই ধরণের মুদ্রার প্রচলন হইতে আমাদের দেশে এখনও গণনা-কালে প্রচলিত 'কাঁহন' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে অনুমান করা যায়। রাজ্যপ্রত্নতত্ত্ব অধিকার হইতে প্রকাশিত এবং পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত রচিত '*An Introduction to the State Archaeological Gallery, West Bengal*' পুস্তকে এই সমস্ত মুদ্রার আলোকচিত্র আছে।

শিয়ানঃ বোলপুর থানার অন্তর্গত এবং বোলপুর রেলষ্টেশন হইতে প্রায় ৪ মাইল পূর্বে নানুর যাইবার পথে এই গ্রাম অবস্থিত। ঋষ্যশৃঙ্গ-মুনির আশ্রম এইস্থানে অবস্থিত ছিল জনশ্রুতি আছে। শিয়ান গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমায় শ্বেতবসন্ত নামে এক হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন কিংবদন্তীও প্রচলিত। মুসলমান আক্রমণের ফলে এই রাজার রাজ্যচ্যুতি ঘটে জনপ্রবাদ আছে। সাম্প্রতিককালে এই গ্রাম হইতে ক্ষুদ্র প্রস্তরায়ুধ আবিষ্কৃত হয়। (

শীতলগ্রাম (সিধলগ্রাম)ঃ ভোজবর্মণের বেলাব তাম্রশাসনে (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দী) এবং ভট্টভবদেবের 'ভুবনেশ্বর প্রশস্তি'তে (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দী) উত্তর-রাঢ় বা রাঢ়ে সিদ্ধলগ্রামের অবস্থিতির উল্লেখ আছে। 'ভুবনেশ্বর প্রশস্তি'তে এই গ্রামকে গ্রামসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, আর্যাবর্তের অলঙ্কারস্বরূপ এবং রাঢ়দেশের সৌভাগ্যলক্ষ্মীরূপে বর্ণিত হইয়াছে লাভপুর থানার অন্তর্গত শীতলগ্রাম বা সিধলগ্রামই উপরোক্ত লেখমালাসমূহে উক্ত 'সিদ্ধলগ্রামের' নামান্তর অনেক পণ্ডিতের ধারণা। ভট্টভবদেব তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও সামরিক বলের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ভট্টভবদেবের বংশের আদিপুরুষ আদিদেব রাঢ়ের সিদ্ধলগ্রামে আসিয়া বসবাস করেন উপরোক্ত লেখ হইতে জানা যায়। তিনি বঙ্গের এক রাজার 'বিশ্রাম-সচিব', 'মহামন্ত্রী', 'মহাপাত্র' এবং 'সান্ধি-বিগ্রহী' ছিলেন। ভট্টভবদেব বর্মণ রাজবংশের হরিবর্মদেবের রাজত্বে 'মন্ত্রশক্তি সচিব' ছিলেন। লাভপুর হইতে কিছুদূর পূর্বে এই গ্রাম অবস্থিত। 'ভুবনেশ্বর প্রশস্তি'টি বর্তমানে ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেব মন্দির-চত্বর সংলগ্ন পশ্চিম দিকের দেওয়ালগাত্রে নিবিষ্ট আছে। পরমানন্দ আচার্য মহাশয়ের মতে এই শিলালিপিটি আদিতে নারায়ণ বা অনন্তনারায়ণের মন্দিরগাত্রে

উৎকীর্ণ ছিল। সেখান হইতে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে এই শিলালিপিটি স্থানান্তরিত হয়, পরবর্তীকালে ভুবনেশ্বরের পুরোহিতগণের অনুরোধে এইটি বর্তমান স্থানে রক্ষিত হয়। (*Proceedings of the Indian History Congress, Third Session, Calcutta, 1939, p-313* দ্রষ্টব্য।)

লাভপুরের কয়েক মাইল পশ্চিমে অবস্থিত সুণ্ডীপুর গ্রামে 'সন্দীপন মুনির আশ্রম' এবং সামান্য দূরে (পশ্চিমে) গোগা গ্রামে 'গর্গমুনির আশ্রম' অবস্থিত ছিল স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস। এই সমস্ত অঞ্চলের প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য সম্ভবতঃ এই ধরণের জনশ্রুতি সৃষ্টি এই ধারণা হয়। এই সমস্ত অঞ্চলে ব্যাপক সমীক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয়। লাভপুরের ২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে গোপালপুর গ্রামের নিকটস্থ স্থানে দুর্বাসামুনির আশ্রম ছিল কথিত হয়। এই কারণে ঐ গ্রাম 'দুবসো-গোপালপুর' নামে অভিহিত।

শেরাণ্ডী: বোলপুর থানার অন্তর্গত এবং বোলপুর হইতে পালিতপুর যাইবার পথে শেরাণ্ডী বা হাট-শেরাণ্ডী বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামের পট-চিত্রকর বা পটুয়াগণের প্রসিদ্ধি আছে। ঐ স্থানের শ্রীআদককুমার সূত্রধরের সহিত কথোপকথনে জানা যায় যে গত সাতপুরুষ যাবৎ এই পরিবার পটচিত্র রচনায় সিদ্ধহস্ত। বর্তমানে গ্রামের কয়েকটি পরিবারের মধ্যে পটে সপরিবারে দুর্গার প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া পূজার রীতি প্রচলিত আছে। বৎসরান্তে পটটি বিসর্জন দেওয়া হয়।

গ্রামের মধ্যে অনেকগুলি মন্দির আছে। দক্ষিণপাড়ায় চারিটি আট-চালা পূর্বদুয়ারী শিবমন্দির আছে। দক্ষিণদুয়ারী একটি শিবমন্দিরে পুষ্পসজ্জার অলঙ্করণ আছে। গ্রামের 'ধর্মতলা'য় দক্ষিণদুয়ারী একটি দেউল আছে। মন্দিরটি ১৭৩৯ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত। প্রবেশপথের খিলানের উপর গৌর-নিতাই-এর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। এতদ্ব্যতীত উপর হইতে নিম্নে লম্বালম্বিভাবে ফলকগুলি সজ্জিত দেখা যায়। দ্বারপালের প্রতিকৃতিও উৎকীর্ণ আছে। পশ্চিমদুয়ারী পঞ্চরত্ন মন্দির নিকটে আছে।

গ্রামের শ্রীগৌরীশঙ্কর ঘোষের বাড়ীর ভিতর একটি 'ত্রয়োদশ রত্ন' মন্দির আছে। পূর্বদুয়ারী এই মন্দিরটি 'নারায়ণ মন্দির' নামে অভিহিত। স্তম্ভযুক্ত খিলানের উপর সন্নিবেশিত ছাদযুক্ত মণ্ডপ মন্দিরসম্মুখে আছে। মন্দিরের ভিতর খিলানের উপর রাধাকৃষ্ণের প্রতিকৃতি এবং বাহিরে শিবের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। উত্তরপাড়ায় পূর্বদুয়ারী দুইটি শিবমন্দির আছে। মন্দিরদ্বয় বঙ্গাব্দ ১২৩৭ সালে বা ১৭৫১ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

রামায়ণ, পৌরাণিক ও কৃষ্ণলীলার কাহিনী মন্দিরগাত্রে সম্মুখে ও পিছনের দিকে ফলকের মধ্যে রূপায়িত। গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় দক্ষিণ-দুয়ারী তিনটি আট-চালা ও একটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। মধ্যপাড়ায় দুইটি সাধারণ শিবমন্দির আছে। গ্রামে একটি এক-বাংলা রীতির মন্দিরও দেখা যায়।

সজিনা: সিউড়ী থানার অন্তর্গত এবং পুরন্দরপুর যাইবার পথে সিউড়ীর প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত হারাইপুর গ্রামের নিকটবর্তী এই গ্রামে কয়েকটি চার-চালা মন্দিরের অবস্থিতির সংবাদ *David McCutchion* রচিত '*The Temples of Birbhum*' প্রবন্ধের ১১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে।

সাঁইথিয়া: পূর্ব রেলপথের সাহেবগঞ্জ লুপলাইনে অবস্থিত অন্যতম প্রধান জংশন ষ্টেশন এবং এই নামের থানার কর্মকেন্দ্র। সাঁইথিয়া রেল-ষ্টেশন সংলগ্ন এবং 'পীঠনির্ণয় তন্ত্রে' (মহাপীঠনিরূপণম্) উক্ত নন্দীপুর নামে খ্যাত এক পীঠস্থান আছে। উপরোক্ত তন্ত্রে বর্ণিত আছে :—

"হারপাতো নন্দিপুরে ভৈরবো নন্দিকেশ্বরঃ।
নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥"
(পাঠান্তরে 'সিদ্ধির্নসংশয়ঃ')।

অর্থাৎ নন্দীপুরে সতীর হার পতিত হয়, তথায় দেবীর নাম 'নন্দিনী' এবং ভৈরবের নাম 'নন্দিকেশ্বর'। 'শিবচরিতের' মতে নন্দীপুর উপপীঠ রূপে গণ্য, তথায় সতীর 'হারাংশ' পতিত হয়, দেবীর নাম 'নন্দিনী' এবং ভৈরবের নাম 'নন্দীশ্বর' উল্লেখ আছে। মন্দিরটি নূতন, চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, মন্দিরমধ্যে আরও দেব-দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন।

সাঁইথিয়া থানার অন্তর্গত বেলিয়া বা বেলেগ্রামে এবং কুনুড়ি গ্রামের 'আউল গোঁসাই পীঠ' উল্লেখযোগ্য। "বেলিয়া বা বেলেগ্রামের সুবিখ্যাত ধর্মশিলা একখণ্ড স্বাভাবিক প্রস্তর, কিন্তু সেটি একটি মুণ্ডহীন মনুষ্যদেহের উপর স্থাপিত। কুনুড়িগ্রামের আউল গোঁসাইএর পীঠটি সমচতুষ্কোণ পোড়ামাটির ফলকের উপর অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটি সমতল চতুষ্কোণ ফলক। তার উপর পর পর অনুরূপ কয়েকটি এগুলি বাঁধানো আছে।" ['রাঢ়ে ধর্মপূজা—বীরভূমে ধর্মঠাকুরের পীঠ'—ডঃ অমলেন্দু মিত্র রচিত 'ভাবমুখে' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায়, ১৩৭৫ (পৃঃ ২৪০-২৪৪) প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠে এই সমস্ত তথ্য জানা যায়।]

লাউগ্রাম: লাভপুর থানার অন্তর্গত এবং লাভপুরের উত্তর-পূর্বে প্রায় মুর্শিদাবাদ সীমান্তে অবস্থিত এই গ্রামে এক মসজিদের অবস্থিতি এবং

তথায় ফার্সীভাষায় লিখিত এক শিলালিপির উল্লেখ *Asiatic Society of Bengal*-এর *Journal*-এ (*J. A. S. B., Vol 20, 1924*) মৌলভী আব্দুল ওয়ালী খান সাহেব তাঁর রচিত '*Notes on the Archaeological Remains of Bengal*'(*pp 489-521*) প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন।

১০৬৪ হিজরী (১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে) শাহ ঔরঙ্গজীব গাজীর রাজত্বকালে সৈয়দ পহাড় নামে জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক এক অলঙ্কৃত মসজিদ স্থাপনের উল্লেখ এই লিপিমধ্যে ব্যক্ত আছে। এই সৈয়দ পহাড়ের বংশ পরম্পরার উল্লেখও এই লিপিতে আছে। সৈয়দ পহাড়ের অপর ভ্রাতাদের নাম যথা ফৎ মুহম্মদ, শরফুদ্দীন এবং মহম্মদ মুরাদের নামও এই লিপি পাঠে জানা যায়।

সাকুলীপুর : নান্নুর থানার অন্তর্গত এই গ্রামে সাফুলেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন জানা যায়। পূর্বে এই গ্রাম 'কিসমৎ সাফুলীপুর' নামে পরিচিত ছিল। নান্নুরের উত্তর-পশ্চিম পার্শ্ববর্তী গ্রাম সাকুলীপুর সম্ভবতঃ পুরাতন নথিপত্রে উল্লিখিত 'কিসমৎ সাফুলীপুর' গ্রাম। ধর্মমঙ্গলে 'সাফুলার' নাম আছে, পার্শ্ববর্তী অনেক গ্রামের সহিত যথা ধর্মমঙ্গলোক্ত সামন্ত-শেখর রাজার রাজধানী 'জলন্দার গড়' নান্নুরের নিকটবর্তী জলন্দী গ্রামকেই সূচিত করে এবং সম্ভবতঃ ধর্মমঙ্গলোক্ত 'সাফুলার' এই 'কিসমৎ সাফুলীপুর' বা বর্তমান সাকুলীপুরকেই সূচিত করে। এই গ্রামে আরবী ভাষায় লিখিত এক শিলালিপির উল্লেখ ডঃ অমলেন্দু মিত্র করিয়াছেন।

সিউড়ী : বীরভূম জেলার শাসনকেন্দ্র এই শহরে অবস্থিত। পূর্ব রেলপথের অণ্ডাল-সাঁইথিয়া শাখার রেলপথে এই শহরে আসা যায়। সিউড়ী শহরের মধ্যে কয়েকটি পুরাতন মন্দিরের অবস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা, বারুইপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত ধাতুনির্মিত সিংহবাহিনী দেবীর মন্দির, বঙ্গাব্দ ১২১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রাধা-বল্লভের মন্দির, ঘনশ্যামদাস প্রতিষ্ঠিত রাধা-দামোদর মন্দির এবং ভবতারিণী কালীমন্দির। বীরভূমের সর্বাপেক্ষা সুন্দর এবং প্রাচীনতম আট-চালা মন্দির শহরের দক্ষিণাংশে সোনাতোড়পাড়ায় অবস্থিত রাধা-দামোদর মন্দিররূপে অভিহিত, এবং বর্তমানে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার সংরক্ষণাধীনে আছে। মন্দিরটি মাকড়া পাথরের ভিত্তিবেদীর উপর ইষ্টক-নির্মিত আটচালা মন্দির 'ঘুনসা'র মন্দির নামেও পরিচিত। মন্দিরগাত্রে প্রধান প্রবেশদ্বারের উপর এবং পার্শ্বে ফুলপাথরের ফলকের উপর অলঙ্করণ আছে। দ্বারের খিলানের উপর বামপার্শ্বে কালীয়দমন, নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণ, মধ্যে রাসমণ্ডল, বস্ত্রহরণ, রাধাকৃষ্ণ, সংকীর্তনের দৃশ্য, দক্ষিণে অনন্তশায়ী

বিষ্ণু, বাহনোপরি ব্রহ্মা, বায়ু, ইন্দ্র, কার্তিক এবং গণেশ ইত্যাদির প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। স্তম্ভগাত্রে এবং দ্বারোপার্শ্বে ফলকের উপর আরও দেবদেবীর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরটি কোন্ সময় প্রতিষ্ঠিত হয় জানা যায় না, তবে শিল্প-শৈলী দেখিয়া অনুমিত হয় যে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিউড়ী 'কালীবাড়ী'তে আরও দুইটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, ১২৮৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই দুইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বামপার্শ্বে 'গোবিন্দেশ্বর মন্দিরে'র প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে স্থূল-বর্তুল রেখায় মণ্ডিত দশমহাবিদ্যাগণের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। পার্শ্বে অবস্থিত 'কুলদেশ্বর মন্দিরের' উপরিভাগে সিংহাসনে রাম-সীতা উপবিষ্ট দেখা যায়। পার্শ্বে যথারীতি আরও প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। কুলদেশ্বর মন্দিরে নিবিষ্ট এক বাতায়নবর্তিনী যুবতী বাঙ্গালী রমণীর দণ্ডায়মান অবস্থার প্রতিকৃতির আলোকচিত্র মুকুল দে রচিত '*Birbhum Terracottas*' পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে (*Plate 34* দ্রষ্টব্য)।

সিউড়ীর বড়বাগান নামে অভিহিত অঞ্চলের দক্ষিণপার্শ্বে ইংরাজদিগের জন্য নির্দিষ্ট সমাধিক্ষেত্রে বীরভূমের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক প্রতিনিধি (*Commercial Resident*) জন চীপসাহেবের উদ্দেশ্যে এক স্মৃতিফলক প্রোথিত আছে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *C. R. Wilson* রচিত *"List of Inscriptions on Tombs or Monuments in Bengal possessing Historical or Archaeological Interest"* শীর্ষক গ্রন্থের ১৫০ পৃষ্ঠায় এই স্মৃতিফলকের উল্লেখ আছে। লাভপুর থানার অন্তর্গত গণুটিয়ার রেশমকুঠিতে চীপসাহেব দেহত্যাগ করেন। শিলাফলকে উৎকীর্ণ লেখ হইতে জানা যায় যে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে *Bengal Civil Service*-এ চীপসাহেব নিযুক্ত হইয়া বীরভূমে ৪১ বৎসর *Commercial Resident* রূপে কার্য পরিচালনার পর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

জেলা সমাহর্তার বর্তমান আবাসস্থলের সন্নিকটবর্তী হোসেনাবাদ অঞ্চল প্রাচীন 'বীর' রাজগণের গ্রীষ্মাবাসের ধ্বংসস্তূপরূপে পরিগণিত হয়।

সিউড়ীর 'ডাঙ্গালপাড়া' অঞ্চল হইতে ক্ষুদ্র প্রস্তরায়ুধের আবিষ্কার সম্বন্ধে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার বাৎসরিক বিবরণীতে উল্লেখ আছে (*Indian Archaeology, 1963-'64, A Review, Ed. by A. Ghosh, p-92* দ্রষ্টব্য)।

সুপুর : বোলপুর থানার অন্তর্গত এবং বোলপুর হইতে প্রায় ২ মাইল পশ্চিমে অজয় নদতীরে অবস্থিত সুপুর এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে' বর্ণিত 'দেবীমাহাত্ম্য' হইতে অবগত হওয়া যায় যে লক্ষ বলি প্রদানপূর্বক সুরথরাজা দেবী চণ্ডীর কৃপা লাভ করেন। বর্তমান সুপুরই পুরাণে বর্ণিত তাঁহার রাজধানী 'স্বপুরের' নামান্তর। যে স্থানে লক্ষ বলি প্রদত্ত হয় তাহা 'বলিপুর' নামে খ্যাত। গ্রামের বাহিরে উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত 'সুরথেশ্বর শিবমন্দির' সুরথরাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় স্থানীয় জনপ্রবাদ বর্তমান। বোলপুর হইতে ইলামবাজার যাইবার পথের দক্ষিণদিকে এই মন্দির অবস্থিত। প্রাচীন মন্দিরের ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অংশবিশেষ এখনও কিছু টিবিটির উপর বিক্ষিপ্ত আছে। বর্তমান মন্দিরটি পুরাতন ধ্বংসস্তূপের উপর সাম্প্রতিককালে পুনর্নির্মিত হয় শুনা যায়। প্রস্তর-নির্মিত দ্বারের চৌকাঠ এবং একটি ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি (ভৈরব নামে অভিহিত) ঐস্থানে আছে। এগুলি খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকের শিল্প-শৈলী অনুসারে নির্মিত। সাম্প্রতিককালে এই টিবি হইতে আদি ঐতিহাসিককালে প্রচলিত কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গ্রামের পশ্চিমাংশে 'সুবিক্ষা' নামে গ্রামদেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। বর্তমানে ইনি চণ্ডীর অপরা দেবীমূর্তিরূপে পূজিতা হইতেছেন। 'ধর্মমঙ্গলে' 'সুবিক্ষা' নামেএক দেবীর উল্লেখ আছে। গ্রামের উত্তর-পশ্চিমাংশে 'কোটের ডাঙ্গা' নামে কিয়দংশ স্থান ব্যাপিয়া বহু প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। 'সুহ্মরায়' নামক ধর্মদেবতার নাম প্রাচীন সুহ্মের স্মৃতিবহ।

সুপুরগ্রামে অনেকগুলি ইষ্টক-নির্মিত মন্দির আছে। অধিকাংশই 'দেউল' রীতির ; একটি পঞ্চরত্ন মন্দির অবশ্য আছে। সুপুরের লালবাজার পল্লীতে দুইটি মন্দির পাশাপাশি অবস্থিত। একটি অষ্টকোণাকৃতি 'দেউল' এবং অপরটি সাধারণ 'দেউল'। মন্দিরগুলির অলঙ্করণে পাশ্চাত্ত্য বেশভূষায় সজ্জিত বিদেশীয় নরনারীর উপস্থিতি দেখা যায়। অষ্টকোণাকৃতি মন্দিরের আটদিকেই ফলকের উপর অলঙ্করণ আছে। অপর মন্দিরের সম্মুখে শুধু অলঙ্করণ আছে। অষ্টকোণাকৃতি মন্দিরটি সম্প্রতি সংরক্ষিত পুরাকীর্তিরূপে ঘোষিত হইয়াছে।

'শ্যামসায়র' পুষ্করিণীর দক্ষিণপার্শ্বে পূর্বদুয়ারী এক মন্দির আছে। মন্দিরগাত্রে প্রতিষ্ঠাফলক এবং প্রতিষ্ঠাতার নাম উৎকীর্ণ আছে। পূর্ব এবং দক্ষিণদিকে মৃৎফলকের উপর অলঙ্করণ আছে। দক্ষিণে মধ্যস্থলে

রামসীতা উপবিষ্ট আছেন, অবতারগণের প্রতিকৃতি এবং কৃষ্ণলীলার ঘটনাবলী লম্বালম্বিভাবে সজ্জিত।

গ্রামের হাটতলায় ১২২৪ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত এক দক্ষিণদুয়ারী পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। মন্দিরের অধিকাংশ ফলকগুলি বর্তমানে অপসারিত। উপরের দিকে কিছু অলঙ্করণ আছে। হাটতলার আর একটি মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপর ফলকে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহিত সংকীর্তনরত অবস্থায় দেখা যায়। মন্দিরটি দক্ষিণদুয়ারী। অন্যান্য অলঙ্কৃত ফলকের সহিত প্রতিষ্ঠাফলকও অপসারিত দেখা যায়।

হাটতলার আর একটি শিবমন্দিরগাত্রে সাম্প্রতিককালে চুন লেপিয়া সংস্কার করা হইয়াছে। পূর্বদুয়ারী এই মন্দির প্রবেশদ্বারের উপর শিবদুর্গার প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ।

সুপুরে নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ বর্তমান। এইখানে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ চৌবন ও মিঃ আরিঅর (*Mr. Chauban* এবং *Mr. Arrear*) নামক দুইজন ফরাসী কর্তৃক কুঠি স্থাপনের সংবাদ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে *Commercial Resident* মিঃ জন চীপের হস্তে এই কুঠির ভার ন্যস্ত হয়।

সুরুল : বোলপুর থানার অন্তর্গত এবং শান্তিনিকেতন হইতে প্রায় ৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত সুরুল একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। বাংলাদেশে ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে এখানে তৎকালীন *Commercial Resident* জন চীপ কর্তৃক এক কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয় যাহা ঐ অঞ্চলে 'চীপ সাহেবের কুঠি' নামে পরিচিত। ইহার পূর্বে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্-লি-সিনর (*Mon-Le-Seigneur*) নামে এক ফরাসী বণিকের সুরুলে উপস্থিতির তথ্য 'বীরভূমের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ডের ৫-৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। কথিত আছে যে ইহারা তদানীন্তনকালের খ্যাতনামা আনন্দচন্দ্র গোস্বামীর নিকট হইতে কয়েক বিঘা ভূমি গ্রহণ করিয়া এখানে গৃহ-নির্মাণ করিয়া এক কুঠির প্রতিষ্ঠা করেন। চীপসাহেব ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে বীরভূমে আগমন করেন। চীপসাহেব দেশের জনসাধারণের সহিত অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা করিতে সর্বসময়ে সচেষ্ট ছিলেন। দেশবাসীও তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। এই জেলায় সর্বপ্রথম নীলের চাষের প্রবর্তন তিনিই করেন এবং পথঘাটের উন্নতিসাধন করেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে গণুটিয়ার কুঠিতে তিনি পরলোকগমন করেন এবং ঐখানেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

সুরুলের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এখানে গ্রামের জমিদার সরকার বাড়ীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইষ্টক-নির্মিত দেবালয়গুলি। এইগুলি ছাড়া

গ্রামের অন্য পল্লীমধ্যেও কতকগুলি মন্দির আছে, তবে সমস্ত মন্দির-গাত্রে অলঙ্করণ নাই।

আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী-জনার্দন বিগ্রহের জন্য উৎসর্গীকৃত পঞ্চরত্ন মন্দিরটি এই গ্রামের মন্দিরগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হইতে পারে। মন্দিরের ক্ষয়প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠাফলক হইতে মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় নির্ধারণ সম্ভব নয়। মন্দিরগাত্রে প্রধানতঃ রামায়ণের ঘটনাবলীই উৎকীর্ণ। তিনটি পত্রাকৃতি খিলানের দ্বারা সজ্জিত মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপর এইগুলি উৎকীর্ণ। প্রবেশপথের উপর অবস্থিত খিলানের মধ্যভাগে রাম-রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য প্রতিফলিত। দক্ষিণের খিলানের উপরিভাগ তিনটি সারিতে বিভক্ত, মধ্যে রাবণরাজা তাঁহার সমরনায়কগণের (?) সহিত আলোচনারত দেখা যায়। উপরে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে অসীম বীর্যবত্তার সহিত হনুমানকে রাক্ষসবাহিনী আক্রমণ করিতে দেখা যায়। নিম্নে অশোকবনে সীতাকে 'চেড়ী'গণ পরিবৃতা অবস্থায় উপবিষ্টা দেখা যায়। হনুমান সম্ভবতঃ সীতাকে কিছু দান করিতেছেন মনে হয়। বামপার্শ্বের খিলানের উপর মধ্য সারিতে রামের রাজ্যাভিষেকের ঘটনাবলী ক্ষোদিত আছে। সিংহাসনে উপবিষ্ট রামসীতার প্রতি জাম্বুবান এবং অন্যান্য বানরাধিপতিদিগকে রামসীতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিতে দেখা যায়। এই দৃশ্যের উপর মহর্ষি বাল্মীকির উপস্থিতিতে মুনিঋষিগণ কর্তৃক এক যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালনার ঘটনা দৃশ্যমান। একদিকে রাক্ষসবাহিনীর সহিত যুদ্ধরত হনুমান এবং নিম্নে প্রসাধনরতা অন্তপুরিকাগণের উপস্থিতিও ফলকে অলঙ্করণের মাধ্যমে রূপায়িত। বামদিকে উপর হইতে নিম্নে লম্বালম্বিভাবে দশাবতারগণের প্রতিকৃতি এবং মন্দিরের বক্রাকৃতি চালের নিম্নে কৃষ্ণলীলার ঘটনাবলী উৎকীর্ণ। ফলকগুলির অলঙ্করণে ক্ষুদ্রাকৃতি পদ্মপুষ্প, পত্রলতা ইত্যাদির প্রয়োগ লক্ষণীয়। দুইকোণে দুই লম্ফনোদ্যত সিংহের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। স্তম্ভগাত্রের কয়েকটি ফলকে অলঙ্করণ আছে।

উপরে বর্ণিত মন্দিরের নিকটেই দুইটি ইষ্টক-নির্মিত দেউল বর্তমান। মন্দিরগাত্রের প্রতিষ্ঠাফলকে ১৭৫৩ শকাব্দ এবং বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ সাল (১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ) ক্ষোদিত আছে। পশ্চিমদিকের মন্দিরটিতে মধ্যস্থলে সিংহাসনে রামসীতা উপবিষ্ট দেখা যায়। হনুমান-জাম্বুবান এবং ঢাল-তলোয়ার হস্তে অন্যান্য সৈন্য-সামন্ত এবং ইউরোপীয় বেশভূষায় সজ্জিতা নারীমূর্তির উপস্থিতি লক্ষণীয়। উপরে এবং দ্বারের দুইপার্শ্বে নারীমূর্তির মুখাবয়বসমূহ ক্ষোদিত। সমাজে প্রতিষ্ঠিতা নারীগণের অন্তঃপুরের মধ্য

হইতে জনসমক্ষে মন্দিরগাত্রে রূপায়ণ পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারের ফলে হইয়াছে ধারণা হয়। প্রাচীনকালে মন্দিরগাত্রে 'অলসকন্যা' বা অপ্সরাগণের মাধ্যমে অলঙ্করণের অনুসরণে এই মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ মর্ত্যলোকের অন্তঃপুরিকাগণকে দেবলোকে উন্নীত করিবার প্রচেষ্টা দর্শনীয়। পৌরাণিক দশাবতার এবং সামাজিক ঘটনাবলীও কিছু উৎকীর্ণ আছে। পূর্বদিকের মন্দিরটির মধ্যস্থলে সপরিবারে দুর্গা-মহিষাসুরমর্দিনীর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। এখানেও পূর্বে বর্ণিত মন্দিরটির মত অন্যান্য প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। মন্দির দুইটির মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

পশ্চিমপাড়ায় আরও একটি দেউল আছে। এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। ১৭৮৩ শকাব্দে বা ১২৬৮ বঙ্গাব্দে (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে) এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। প্রবেশপথের উপর খিলানে রামসীতা সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখা যায়। এইটির উপর আড়াআড়িভাবে বীণাহস্তে শিব এবং তাঁহার পার্শ্বে সপারিষদ পার্বতীকে তাঁহার সন্তান গণেশকে আদররতা অবস্থায় দেখা যায়। ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের দৃশ্যও এই ফলকে উৎকীর্ণ। মন্দিরের সম্মুখে দুইপার্শ্বে অশ্বারোহী গজসিংহের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। সামাজিক এবং দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী ফলকের মধ্যে প্রতিফলিত। মন্দিরের পাদদেশে সাহেব এবং মেমসাহেবদিগকে জানালার মধ্য হইতে অপাঙ্গদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখা যায়। পৌরাণিক দেব-দেবী যথা কার্তিক, যম এবং দশাবতারগণের প্রতিকৃতিও উৎকীর্ণ।

এইস্থানে একটি আট-চালা মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রবেশপথের খিলানের উপর সামান্য অলঙ্করণ দেখা যায়। মধ্যস্থলে প্রস্ফুটিত বিভিন্ন আকৃতির পদ্ম এবং ক্ষুদ্র মন্দিরের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ। মন্দির-মধ্যে গণেশের মূর্তি ক্ষোদিত। দক্ষিণের খিলানের উপর এই একই ধরণের অলঙ্করণ, তবে এইস্থানে মন্দির-মধ্যে একটি পদ্মপুষ্প ন্যস্ত আছে। বামদিকের খিলানের উপর ক্ষোদিত ফলকগুলির মধ্যে এই একই অলঙ্করণ দেখা যায়। তবে এখানের মধ্যের ক্ষুদ্র মন্দির-মধ্যে বাম হস্তে পদ্ম ও দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালাধারী এক দেবমূর্তি ক্ষোদিত দেখা যায়। চুন-বালির পলস্তারার সাহায্যে অন্যান্য অলঙ্করণের মধ্যে ঐশ্লামিক প্রভাবে মণ্ডিত ফুলদানী, গোলাপজলদানের ইত্যাদির প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ।

'পূর্বপাড়া'য় আর একটি দেউল জীর্ণ অবস্থায় দেখা যায়। মন্দিরটি সম্ভবতঃ ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে কয়েকটি ফলকে অলঙ্করণ আছে।

হারাইপুর : সিউড়ী থানার অন্তর্গত এবং সিউড়ী হইতে পুরন্দরপুর যাইবার পথে সিউড়ীর প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এই গ্রাম অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিমপার্শ্বে অবস্থিত 'শলখানা' নামক অঞ্চলে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষার পরলোকগত রবীশচন্দ্র করের পরিচালনাধীনে এবং আর. জি. পাণ্ডে ও আমীর সিং-এর সহায়তায় এক খননকার্য পরিচালিত হয়।

এইস্থানে খননকার্যের ফলে নিম্নের স্তরসমূহ হইতে সাধারণ এবং চিত্রিত এই উভয় শ্রেণীর কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণের মৃৎপাত্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীকালে ধূসরবর্ণের মৃৎপাত্রের ব্যবহারের প্রচলন দেখা যায়। স্তরবিন্যাসের উপরিভাগে কোন সৌধের ভগ্ন ইষ্টকসমূহ পতিত থাকিতে দেখা যায়।

খননকার্যের মাধ্যমে ১০টি প্রলম্বিত শিশু-সমাধি উত্তর-দক্ষিণে শায়িত আছে দেখা যায়। মৃতদেহের মস্তক পশ্চিমদিকে ঈষৎ হেলানো। সমাধিগুলির মধ্যে অন্য কোন প্রত্নবস্তু পাওয়া যায় নাই। সমাধিগুলির অস্থি ইত্যাদি বর্তমানে ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষার বীক্ষণাগারে পরীক্ষাধীনে আছে।

হালসোট : দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত এবং দুবরাজপুরের প্রায় ২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে 'দাঁতিনদীঘি' নামে এক জলাশয় আছে। জনশ্রুতি আছে খগাদিত্য নামে এক রাজা এই জলাশয় খনন করেন। পার্শ্ববর্তী খগড়ো গ্রামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত খগেশ্বর শিবমন্দির বর্তমান। মন্দিরের আলোকচিত্র গৌরীহর মিত্র রচিত 'বীরভূমের ইতিহাস', প্রথম খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠায় আছে। এই মন্দিরের স্থাপত্য-শিল্প দেখিয়া ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন যে "বাঙ্গালাদেশে এই *style*এর মন্দির আছে ইহা জানিতাম না। বাঙ্গালাদেশের মন্দির-শিল্পের ইতিহাস লিখিতে এই মন্দিরটি খুব কাজে লাগিবে।" আলোকচিত্র উপরোক্ত গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত আছে।

পার্শ্ববর্তী ফুলবেড়া গ্রামে দান্তেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে কথিত হয়। পীঠস্থানরূপে এই স্থানটি পবিত্র, স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস।

হেতমপুর : দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত এবং দুবরাজপুর হইতে প্রায় দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত হেতমপুর একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। গ্রামের স্বনামধন্য জমিদার চক্রবর্তী বংশীয়দিগের আবাসস্থল এখন 'রঞ্জন প্যালেস' নামে খ্যাত এক দ্রষ্টব্য স্থান। আপাততঃ জমিদার বংশের ব্যক্তিগত

বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হইলেও পূর্বে অনুমতি লইয়া প্রাসাদ অভ্যন্তরের কয়েক স্থানে প্রবেশ করা যায়। মুর্শিদাবাদের 'হাজার-দুয়ারী' প্রাসাদের ন্যায় এইস্থানের 'রঞ্জন প্যালেস'ও নানা চিত্রকলায় ও প্রাচীন দ্রব্যসামগ্রীতে পূর্ণ। প্রাসাদে দুইটি সিংহদ্বার বিশিষ্ট তোরণ অতিক্রম করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, সিংহদ্বারের উপর ঘড়িঘর (*Clock Tower*) স্থাপিত।

পূর্বদিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলে হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ ভবন দেখা যায়, বীরভূমের প্রাচীনতম কলেজ এইটি। তারপর 'লালদীঘি' নামক পুষ্করিণী, লালদীঘির দক্ষিণে বাঁধাঘাটের নিকট স্থান 'কদমতলা' নামে খ্যাত, ঐস্থানে ৫টি পুরাতন শিবমন্দির আছে। কদমতলার দক্ষিণে জমিদার বংশের ছোটতরফের প্রতিষ্ঠিত তিনটি শিবালয় আছে। তাহার দক্ষিণে পুরাতন রাজবাড়ী, এখানেও অর্ধবৃত্তাকার এক সিংহদ্বার ও লৌহফটক অতিক্রম করিয়া রাজবাড়ী মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। বর্তমানে এইটি বিদ্যালয়রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। রাজবাড়ী মধ্যে বিরাট চত্বর ও শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ জীউর ঠাকুর বাড়ী।

গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে 'গড়ের মাঠ' নামক সুবিস্তৃত প্রান্তর। এই প্রান্তর-মধ্যে 'শেরিনা বিবির সমাধি' আছে (বনবিভাগের ডাক-বাংলোর সন্নিকটে)। 'গড়ের মাঠে'র পূর্বাংশে 'হাফেজ খাঁর বাঁধ' নামে এক অর্ধচন্দ্রাকৃতি দীর্ঘিকা আছে। শেরিনা বিবি এবং হাফেজ খাঁ সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি এই অঞ্চলে প্রচলিত। এই বাঁধের অনতিদূরে 'কৃষ্ণনগরের গড়' অবস্থিত। প্রাচীন 'হেতমপুরের গড়' এখানেই অবস্থিত ছিল।

'গোবিন্দ সায়রে'র এক কোণে বিবিধ কারুকার্য খচিত 'চন্দ্রনাথ শিবমন্দির' প্রতিষ্ঠিত আছে। হেতমপুরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গাব্দ ১২৫৪ সালে অর্থাৎ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরগাত্রে নিম্নে বর্ণিত লেখ উৎকীর্ণ আছে। 'বীরভূম বিবরণ', ১ম খণ্ডের ৬০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বিবরণী হইতে এইটি উদ্ধৃত হইল :—

"স্থাপিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র মুদেকর
চন্দ্রনাথ শিবাচন্দ্র হরমেস্নী চন্দ্রশেখর ॥"

অষ্টকোণাকৃতি এই মন্দির পূর্বদুয়ারী। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকে গণেশ-জননী, জগদ্ধাত্রী, স্নানরতা রমণী, গজলক্ষ্মী প্রভৃতি হিন্দু পৌরাণিক ও সামাজিক দৃশ্যাবলীর রূপায়ণ ব্যতীত ইউরোপীয় প্রভাবে মণ্ডিত শিল্পশৈলীর সার্থক রূপায়ণ এই মন্দিরের মধ্যে উৎকীর্ণ। ইউরোপীয়

প্রভাবে উৎকীর্ণ বিভিন্ন জননায়ক, কবি, রাণী ভিক্টোরিয়া ইত্যাদির প্রতিকৃতি এমন কি ইউরোপীয় অলঙ্কার শৈলীও সুন্দরভাবে মৃৎফলকে রূপায়িত দেখা যায়।

মন্দিরচূড়ায় প্রতিষ্ঠিত মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ দেবদূত বা দেবকন্যাগণকে সূচিত করে। নবরত্ন মন্দির ইউরোপীয় ভাবাদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া এই মন্দিরের স্থাপত্য-শিল্পে এক নবরূপের সৃষ্টি করিয়াছে। ইউরোপীয় নরনারীর মুখাবয়বগুলি সুন্দরভাবে প্রতিফলিত। সম্প্রতি এই মন্দিরটি রাজ্যসরকার কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে।

এই মন্দিরের অদূরে 'দেওয়ানজী শিবমন্দির' আখ্যায় অভিহিত এক 'দেউল' আছে। দক্ষিণদুয়ারী এই মন্দিরের দুই পার্শ্বে মৃৎফলকের উপর অলঙ্করণ আছে। প্রবেশপথের উপরিভাগে সিংহাসনে উপবিষ্ট রামসীতা এবং পূর্বদিকে গোপিনীসহ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ আছে। ইহার উপরিভাগে পৌরাণিক কাহিনীসমূহ রূপায়িত। দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণের মথুরা যাত্রার দৃশ্য ফলকের মধ্যে ক্ষোদিত। ক্ষুদ্র ফলকগুলির মধ্যে সাহেব, মেমসাহেব, দেবতা, নৃত্যরতা নারীমূর্তি ইত্যাদি উৎকীর্ণ। পার্শ্বে অবস্থিত দুইটি মন্দিরের কোন অলঙ্করণ নাই।

number) দ্রষ্টব্য।] দেওয়ানজী ও তাহার পার্শ্ববর্তী মন্দিরটি সম্প্রতি রাজ্য সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত গৌরাঙ্গ মন্দিরটিও দর্শনীয়। মন্দিরগাত্রে কোন অলঙ্করণ নাই।

হেতমপুরের নিকটবর্তী গিরিডাঙ্গার প্রান্তর হইতে মধ্য ও শেষ প্রস্তরযুগে ব্যবহৃত প্রস্তরায়ুধসমূহ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের পক্ষ হইতে পরিচালিত অনুসন্ধানের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হইয়া স্থানটির সবিশেষ প্রাচীনত্বের কথা ঘোষণা করে। (*Indian Archaeology, 1965-'66, A Review, Ed. by A. Ghosh, Cyclostyled copy, Section I-107* এবং পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত রচিত 'প্রাগৈতিহাসিক বাংলায় প্রস্তরযুগ ও তাম্রাশ্মীয় সভ্যতা' শীর্ষক প্রবন্ধ পৃঃ-৫৮৭, 'অমৃত', পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যা,

---